না। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞদিগের মন্তব্য কথা; কি? না, জড়জগৎকে যদি জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত বলিয়া ভাবা যায়, তবে সমস্ত জড়জগৎই এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহা শূন্যও নয়, একও নয়, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি একটা অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। জড়বস্তুর স্বরূপ (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-চ্যুত জড়বস্তু স্বয়ং) শূন্য অপেক্ষা অধিক অথচ এক-অপেক্ষা (অর্থাৎ একটা-কোন-কিছু অপেক্ষা) কম। কিন্তু এ তো একটা অর্থ-শূন্য স্ববিরোধী ব্যাপার। বটেই তো;—উহা যদি অর্থশূন্য না হইবে, তবে প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা উহাকে অর্থবত্তায় উত্তোলন করিবার জন্য এত যে আয়াস পাইয়াছেন—তাহা কি শুদ্ধ কেবল তেলা-মাথায় তেল দিবার জন্য! কেননা, অগ্রে অর্থ-শূন্য সামগ্রী হস্ত-গত হইলে তবে তো তাহাকে অর্থবান্ করিয়া গড়িয়া তোলা—একটা কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে মৃত্তিকার যোগাড় করা চাই তো। এইজন্য প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সমস্ত জড়জগৎ—অর্থশূন্য এবং স্ববিরোধী। কিন্তু অর্থ-শূন্য সামগ্রী জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, ঠিক্ই বটে—তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই এই যে, তাহা সেই অর্থ-শূন্য অবিদ্যাকে গ্রহণ করে—এবং তাহাকে জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেয়; জ্ঞান তখন আপনার মাল্ মস্‌লা তাহাতে সংযোগ করিয়া তাহাকে অর্থ-বিশিষ্ট জ্ঞেয়-বস্তু করিয়া গড়িয়া তোলে—অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে, যাহা এক অপেক্ষা কম (মনে কর যেন অর্দ্ধাংশ) তাহাতে অবশিষ্ট অংশ সংযোগ করিয়া তাহাকে একে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক জগৎকে জ্ঞান-গম্য করিয়া তুলিবার জন্য যাহা আবশ্যক—জ্ঞান তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতেই যোগাইয়া দেয়; এইরূপে জ্ঞান স্ববিরোধী অবিদ্যাকে আপন অধিকারাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া বিদ্যাতে পরিণত করে।

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা এ যাহা করিয়াছেন তাহা ঠিক্ই করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

প্রাচীন দর্শন-কারেরা যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্নটির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে, প্রকৃত প্রণালী অনুসারে তাহার মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া গড়িয়া তোলা—এইটি কিরূপে হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের অন্বেষণের বিষয় ছিল; তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য প্রশ্নটিকে নানা আকারে দাঁড় করানো যাইতে পারে কিন্তু তাঁহারা তাহাকে খুব একটি ভাল আকারে দাঁড় করাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই যে, সেই যে, একটা অবোধ্য এবং স্ববিরোধী ব্যাপার—তাহা যে, বস্তুটা কি, তাহা স্থির করা; কারণ, যদি অবোধ্য না থাকে, অথবা তাহাকে যদি খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে সেই খানেই উক্ত প্রশ্ন এবং মীমাংসা উভয়েরই প্রাণ ত্যাগ হয়। এইরূপ বিবেচনায় তাঁহারা জড়বস্তুর স্বরূপকে স্ববিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি এই স্ববিরোধীকে অবিরোধী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে কোন-না-কোন প্রকারে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক। এই জন্য অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই—কি উপায়ে সেইটি সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা অবধারণ

করা। তাঁহাদের মতে সে উপায়—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই হ'চ্চে—ঐকান্তিক অবোধ্য ব্যাপারকে—অবিদ্যাকে—আনিয়া জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেওয়া। এইরূপ, জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভেদের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাইতেছি যে, প্রাচীন দর্শনের মীমাংস্য প্রশ্নের আকার প্রকার এবং তাহার মীমাংসা কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি দুইই এ বিষয়ে একবাক্য যে, ইন্দ্রিয় ঐকান্তিক অবোধ্য-রূপী অবিদ্যারই গ্রাহক; আর, এ মতটির সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দর্শনকারেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা যেমন-তেমন প্রভেদ নহে, তাহা স্বরূপ-গত এবং মূল-গত প্রভেদ।

কেন যে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সহসা প্রতীয়মান হয় না তাহার কারণ নির্দেশ ॥ ১৫ ॥

কেন যে, এই সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য বলিবামাত্রই লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহার কারণ আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, বাস্তবিক ধরিতে গেলে যদিচ আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করি, কিন্তু আমরা মনে করি—যেন আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অপর কোন-কিছুই উপলব্ধি করিতেছি না; অন্ততঃ আমাদের আটপহুরিয়া মনের দশা ঐরূপ। এই জন্য আমরা মনে করি যে ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞান-সমক্ষে অবোধ্য সামগ্রী উপস্থিত করে না—বোধ্য সামগ্রীই উপস্থিত করে। এটা তখন আমাদের মনে থাকে না যে, জ্ঞানের গুণেই বস্তু-সকল বোধ্য হয়—ইন্দ্রিয়ের গুণে নহে। বোধ্য বস্তু হইতে যদি জ্ঞানকে টানিয়া লওয়া যায় তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে ঐকান্তিক অবোধ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কেননা জ্ঞানের প্রকৃতিই এই—শুদ্ধ কেবল আমার জ্ঞানের বা তোমার জ্ঞানের নহে কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই প্রকৃতি এই—যে, তাহা আপনাকে না জানিয়া কোন বস্তুকেই জানিতে পারে না। এ কথা যদি সত্য হয় যে, নিকৃষ্ট জীবেরা আপনাকে আপনি জানে না (ইহা খুবই সম্ভব যদিচ এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাই না) তাহা হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও তাহারা অর্থশূন্যতা মূর্ত্তিমান, আর, নিছক্ অবিদ্যার প্রতিই তাহারা অষ্ট প্রহর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহে।

জ্ঞান কি দিয়া অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া তুলে এইটিই কঠিন প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞানের ঐন্দ্রিয়ক অবয়বটির সম্বন্ধে এইরূপ তো স্থির করিলেন যে, তাহা স্ববিরোধী অর্থশূন্য অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু জ্ঞানের অপর অবয়বটি যে, কি, অতীন্দ্রিয় অবয়বটি যে, কি—যাহার সংস্পর্শ-মাত্রে অবিদ্যার আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান স্ববিরোধী এবং অর্থশূন্য জগৎ সৌন্দর্য্য সুশৃঙ্খলা এবং জ্ঞানের আলোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে তাহাই বা কি, আর, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহা স্থির করিতে তাঁহাদিগকে অধিকতর আয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিথাগোরাসের মত এই যে, সংখ্যা—যাহা জ্ঞানের একটি নিজের প্রদত্ত সামগ্রী, তাহারই প্রসাদে ঐরূপ সুপরিণাম সংঘটিত হয়। প্লেটো বলেন—মৌলিক ভাব-সকলের গুণেই ঐরূপ হয়। বর্ত্তমান সংহিতার মতানুসারে, বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের স্ফুরণ বশতই ঐরূপ হয়।

আত্মজ্ঞানই অন্ধকারের আলোক—স্ববিরোধী বিবাদ-বিসম্বাদের প্রশামক, বিভ্রান্তকারী অব্যবস্থার ব্যবস্থাপক—একত্ব এবং অনেকত্ব উভয়েরই মূল; এইটিই সেই অমূল্য স্পর্শমণি যাহার গুণে অবিদ্যা বিদ্যাতে পরিণত হয়। উপরে যে তিনটি মতের উল্লেখ করা হইল পিথাগোরাসের মত—প্লেটোর মত—ও আমাদের এখানকার মত, তিনই এই বিষয়টিতে একবাক্য যে, উক্ত অতীন্দ্রিয় অবয়বটি জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক বৃত্তি—ঐন্দ্রিয়ক অবয়ব-গুলি জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি; কেবল সেই সার্ব্বভৌমিক বৃত্তিটি যে, কি, ইহা লইয়াই তিনের মধ্যে যত কিছু মত-ভেদ; পিথাগোরাসের মতে তাহা সংখ্যা, প্লেটোর মতে তাহা মৌলিক ভাব, আমাদের মতে তাহা আত্মজ্ঞান।

মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রে আছে

"মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ স মুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

মৌন প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না, অরণ্যবাস প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না; যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই মুনিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে এই যে, মৌনব্রত শুদ্ধ কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র; আপনার লক্ষণ জ্ঞাত হওয়াই তাহার প্রকৃত লক্ষ। আপনার লক্ষণ আপনার নিকট হইতেই জানিবার কথা, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিখিবার কথা নহে। যাহা অন্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহারই জন্য ভাষা-ব্যবহার আবশ্যক; কিন্তু যাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহার জন্য ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাক্য এমনি আমাদের মুখস্থ যে, যখন আমরা মনোমধ্যে কোন একটি বিষয়ের তোলা পাড়া করি, তখনও আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে পারি না। অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকি না, আমরা আপনার সঙ্গেও বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা যখন আপনার সঙ্গে আপনি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন তাহার মধ্যেও আবার বাক্যের আড়াল কেন? আপনার মনের ভাব অন্যকে বুঝাইতে হইলে অথবা অন্যের মনের ভাব আপনি বুঝিতে হইলে, বাক্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না—ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে বাক্য উচ্চারণে কি লাভ? লাভ দূরে থাকুক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে—শেষোক্ত স্থলে বাক্য অভীষ্ট সাধনের অনুকূল তত নহে যত প্রতিকূল। অনেক সময়ে আমরা বাক্যের মোহিনী শক্তিতে এমনি অথর্ব্ব বনিয়া যাই যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মের ভিতরে যে, একটু স্থির চিত্তে তলাইয়া দেখিব, সে শক্তি আমাদের ত্রিসীমা হইতে পলায়ন করে। মনে কর যে, আমাকে লক্ষ করিয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদ পত্র হইতে এই একটি মোহিনী বাণী উত্থিত হইল যে, অমুক ব্যক্তি অসামান্য জ্ঞানী; অমনি, আমার মনোমধ্যে "আমি জ্ঞানী আমি জ্ঞানী" এই কথাটিই ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; শুদ্ধ কেবল ঐকথাটি মনোমধ্যে চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি—তাহার অর্থ

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৩ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সঙ্গীত।

বেহাগ—তাল একতালা।

১

এ ঘোর আঁধারে, বিজন কন্দরে, এ-
কাকী এ কোন্ যোগী।
নীরব প্রকৃতি, না হেরি আকৃতি, নাহি
জাগে রোগী ভোগী।
গভীরতা যেন পেয়েছে চেতন, ঘো-
ষিছে চৌদিকে নিশান আপন,
আকার ছাড়িয়া, রয়েছে বসিয়া, মহা-
শূন্যে প্রাণ জাগি।
কি তপ প্রভাবে জ্বলে দীপ শিখা!
অসীম সুন্দর আছে তায় লেখা,
মুগধ পরাণ, যতি এক-ধ্যান, এক
প্রেমে অনুরাগী।

২

কীর্ত্তন ভাঙ্গা যাত্রার সুর।

দেশের ছেলে দেশে যাব এই আনন্দ
আস্‌ছে মনে,
(সে দেশ স্বদেশ আমার—বাপের বাড়ী)
সেই বাপের বাড়ী নৃত্য করি বেড়াইব
বাপের সনে।
এ-দেশের কাজ হলো সারা ভাঙ্গলো
এ ঘর কাল-তুফানে,
(এদেশ কালে গড়ে, কালে ভাঙ্গে, কালের
অধীন এ)
স্বদেশ সে নহে এ ভব,
নিত্য সেথাকার বিভব,
মৃত্যু সেথা পরাভব অমৃত সত্য শাসনে;
সেথা চাইলে আমি সকল পাব,
পিতার প্রেমে পুলোকিত রব,
এখন এ ভাঙ্গায় আর নাই প্রয়োজন
করবো রতি উন্নবীনে।

মানবীকরণই বটে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা অতি দীর্ঘকাল পরে আমাদের প্রতিশ্রুত প্রস্তাব লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এত বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা বিষয় কার্য্য এবং পারিবারিক পীড়া নিবন্ধন এত ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি

নাই। সম্প্রতি কিছু অবকাশ হওয়াতে আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচনা করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলেন যে, "যাঁহারা বাস্তবিক মনে করেন যে, ঈশ্বর চেতন পদার্থও নহেন—অচেতন পদার্থও নহেন, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই জানেন। ইত্যাদি।" এই স্থলে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে, কেবল "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ" করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তিনি ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া ঝগড়া করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ কি "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" যদি আমি বলি যে, আমার হস্তের কলমটী উষ্ণও নহে এবং শীতলও নহে তাহা হইলে কি দ্বিজেন্দ্র বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, আমার হস্তে একটী উষ্ণ শীতল কলম আছে?

[প্রভাত বাবুর হস্তের কলম যদি শীতল না হয় তবে তাহা অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু অশীতল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উষ্ণ এবং (২) না শীতল না উষ্ণ। অতএব এই পর্য্যন্তই বলিতে পারা যায় যে, কলমটি প্রথম শ্রেণীর অশীতল নহে—উষ্ণ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে মূলেই অশীতল নহে, তাহা নহে; কলমটি যখন—না শীতল না উষ্ণ—তখন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলমটিকে চাই দুই শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,
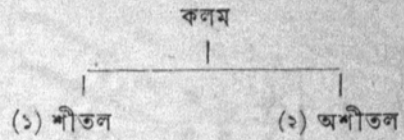
চাই তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,
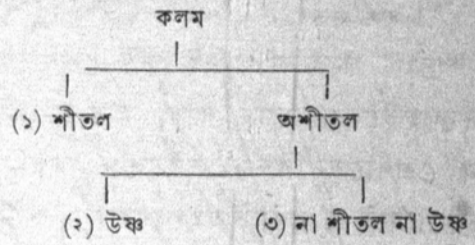
তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। প্রভাত বাবুর এইটি কেবল জানা উচিত যে, কলম পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্, আর শেষোক্ত তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্—উভয়-পক্ষেই এটা স্থির যে, কলমটি যদি শীতল না হয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অশীতল। এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয় তবে তাহা অনুষ্ণ; কিন্তু অনুষ্ণও দুইটি অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—

কলম

(অ) উষ্ণ (আ) অনুষ্ণ

(ই) শীতল (উ) না শীতল না উষ্ণ
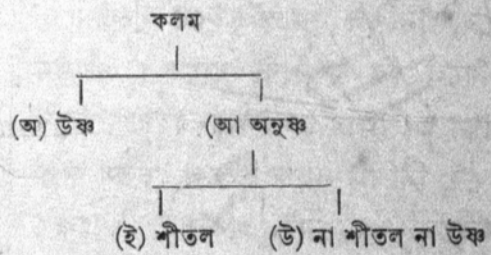
স্পৃশ্য বস্তু অ আ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক, আর, অ ই উ এই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; উভয় পক্ষেই এ কথাটির এক চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা অনুষ্ণ। এ যেমন, তেমনিই সচেতন কিম্বা অচেতন যতই অবান্তর শ্রেণীতে

বিভক্ত হউক্ না কেন—এ কথাটি কিছুতেই টলিবার নহে যে, যাহা সচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই অচেতন ও যাহা অচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই সচেতন।

পদার্থ

(ক) সচেতন (খ) অচেতন

(চ) তাড়িতাদি সূক্ষ্ম ভূত (ট) স্থূল ভূত
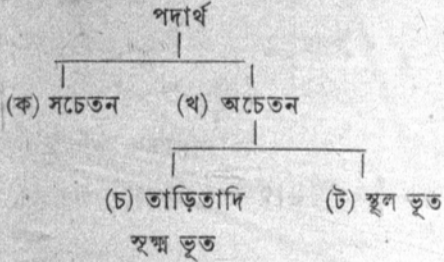
পদার্থ সমূহ ক খ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও যেমন, আর, ক চ ট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তেমনি, উভয়-পক্ষেই এ কথাটি যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত যে, যে কোন পদার্থই হউক না কেন তাহা যদি সচেতন না হয় তবে তাহা অচেতন। এত কথায় কাজ কি—প্রভাত বাবুর ন্যায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবশ্য বীজগণিত জানেন তাহাতে আর ভুল নাই। বীজগণিতের নিয়মানুসারে এইরূপ ধার্য্য করা হউক্ যে, চেতন-পদার্থ=চে, অচেতন পদার্থ=অচে, এবং নিখিল সমস্ত—যাহার বাহিরে অন্য কোন সামগ্রী নাই—সেই নিখিল সমস্ত=নিখি; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতনকে বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে? একজন পাঠশালার বালকও ইহার এইরূপ উত্তর দিবে যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতন অপহৃত হইলে অচেতনই অবশিষ্ট থাকে; বীজ-গণিতের ভাষায়—

নিখি—চে=অচে;

অতএব, অচে+চে=(নিখি—চে)+চে=নিখি

(১) কিন্তু নিখিল সমস্তের বাহিরে অন্য কোন সামগ্রীই নাই।

(২) উপরে পাওয়া গেল যে, চে+অচে=নিখি।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, চে+অচে, ইহার বাহিরে অন্য কোন পদার্থই নাই; কাজেই, যে-কোন পদার্থই হউক্ না কেন—তাহা হয় চেতন পদার্থ—নয় অচেতন পদার্থ—তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রভাত বাবুর একটি কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তিনি অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই কথার অর্থ কি ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" হায়! এটাও কি প্রভাত বাবুকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে যে, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন—এ কথাও যা, আর, অচেতনও বটেন চেতনও বটেন (এক কথায়—অচেতন চেতন) এ কথাও তা, দুইই অবিকল সমান? প্রভাত বাবু তবে নিম্নে একটু প্রণিধান করুন;—এই মাত্র আমরা বীজগণিতের নিয়মানুসারে প্রমাণ করিলাম যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন এবং যাহা অচেতন নহে তাহা চেতন; অতএব—

চেতনও নহেন=অচেতন

অচেতনও নহেন=চেতন

অতএব, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন=অচেতন চেতন।

অথবা

না চেতন=অচেতন (যেহেতু না=অ)

না অচেতন=চেতন(যেহেতু দুই না=এক হাঁ)

অতএব প্রমাণ হইল যে, না চেতন না অচেতন=অচেতন চেতন। শ্রীদ্বি]

বাস্তবিক আমরা কোথায়ও ঈশ্বরকে অচেতন চেতন পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, এক প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী মনুষ্য আছেন

যাঁহারা ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই বলেন না কিন্তু এমত গুণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন যাহার কোনও রূপ জ্ঞান জগৎ দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

[জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ কথাটিও স্বীকার্য্য যে, জগৎ ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে—সুতরাং জগৎ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। "মানবী করণ" প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ সত্যমাত্র, মনুষ্য—সত্য এবং জ্ঞান দুইই একাধারে, ঈশ্বর—সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত তিনই একাধারে। অতএব জগৎও সত্য, ঈশ্বরও সত্য—প্রভেদ কেবল এই যে, জগৎ অপূর্ণ সত্য ঈশ্বর পরিপূর্ণ সত্য। তেমনি, মনুষ্যও চেতন পদার্থ,ঈশ্বরও চেতন পদার্থ—প্রভেদ কেবল এই যে, মনুষ্য অপূর্ণ চৈতন্য, ঈশ্বর পরিপূর্ণ চৈতন্য। কিন্তু প্রভাত বাবু ইহার বিপরীতে এইরূপ বলেন যে, জগতের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা ঈশ্বরেতেও আছে; প্রভাত বাবুর এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, অস্তিত্ব বলিয়া যে একটি লক্ষণ—যাহা জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না—ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না;—যেহেতু জগতের মধ্যস্থিত কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না! এ কিরূপ কথা! স্বয়ং ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব নাই তবে জগতের অস্তিত্ব কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে? জগতের সকলই তো আপেক্ষিক; আপেক্ষিক সত্তা কি আপনার উপর আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তাহা যদি সে পারে—তবে আর তাহা আপেক্ষিক কিসে? তবে তাহাই তো পূর্ণ সত্তা। আপেক্ষিক সত্তা যদি আপনার উপরে দাঁড়াইয়া নাই তবে কিসের উপরে দাঁড়াইয়া আছে? পূর্ণ সত্তার উপরে—তাহাতে আর ভুল কি? অতএব, জগতের সত্তা আছে বলিয়া এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বরের সত্তা নাই—তাহাতে উল্টা আরো এইরূপ প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু জগৎ দুইভাগে বিভক্ত—চেতন এবং অচেতন; অচেতনের সত্তাকে যদি একগুণ সত্তা বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, চেতনের সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। কেননা অচেতনের আপনার সত্তা তাহার আপনার নিকটে প্রকাশ পায় না—তাহার আপনার সত্তা তাহার আপনার ভোগে আসে না; অচেতনের সত্তা পরভোগ্য। চেতনের সত্তা নিজ-ভোগ্য, কেন না চেতনের আপনার সত্তা আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। অতএব সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা

সত্তা
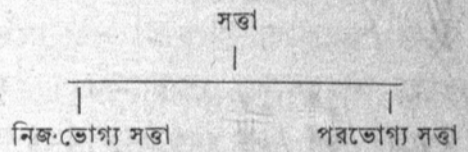
নিজ-ভোগ্য সত্তা | পরভোগ্য সত্তা

পরভোগ্য সত্তাতে সত্তার শুদ্ধ কেবল ভোগ্য অবয়বটিই—জ্ঞেয় অবয়বটিই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভোক্তৃ-অবয়বের বা জ্ঞাতৃ-অবয়বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না; এই জন্য বলি যে, তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা। নিজভোগ্য সত্তা আপনিই আপনার ভোগ্য এবং আপনিই আপনার ভোক্তা—অতএব নিজভোগ্য সত্তাতে সত্তার ভোগ্য অবয়ব এবং ভোক্তৃ-অবয়ব দুইই একাধারে বর্ত্তমান; এইজন্য আমরা বলি যে, নিজভোগ্য সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। পূর্ব্বোক্তরূপ একগুণ সত্তাকেই আমরা বলি অচেতন সত্তা, আর, শেষোক্ত

রূপ দ্বিগুণ সত্তাকেই আমরা বলি চেতন সত্তা। ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা, সুতরাং তাঁহাতে শুধু যে কেবল একগুণ সত্তাই আছে—দ্বিগুণ সত্তা নাই—ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরের সত্তা যখন পরিপূর্ণ সত্তা, তখন তিনি অবশ্য জ্ঞান-স্বরূপ। মনুষ্যেরও জ্ঞান আছে—কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে, মনুষ্যের জ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বিগুণ সত্তা অবশ্য জড়পদার্থের একগুণ সত্তা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, তথাপি তাহাতেও সত্তার অভাব আছে; কেবল, যিনি পূর্ণ-জ্ঞান তিনিই পূর্ণ সত্য, যেহেতু তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই। সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে; জগতে আমরা দুইরূপ সত্তা অবলোকন করি নিজ-ভোগ্য এবং পরভোগ্য। জগতের মধ্যস্থিত এই উভয়-প্রকার সত্তাই আপেক্ষিক সুতরাং উভয়ই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়ে অবস্থিতি করি-তেছে। পূর্ণসত্তাতে কোন সত্তারই অভাব নাই সুতরাং তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা নহে, তাহা পরভোগ্য অচেতন সত্তা নহে;—তাহা নিজভোগ্য চেতন-সত্তা। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন-সত্তা নহে, তাহা পরিপূর্ণ চেতন-সত্তা; কেননা পরিপূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, পূর্ণ সত্তাই চেতনা-চেতন সমস্ত আপেক্ষিক সত্তার মূলাধার, আর, পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না; অতএব যিনি সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ। শ্রী দ্বি]

যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু নাস্তিকতা রক্ষা ক-রিয়া বলিতেন যে তিনি জগতে চেতন ও অচেতন এই দুই পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিটীর মূলে যে কোনও দোষ আছে ইহা আমরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতাম না। কারণ নাস্তিকগণ পার্থিব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। সেই পার্থিব পদার্থ সকল হয় চেতন, না হয় অচেতন এই দুয়ের এক হইবে।

[অনতিপূর্ব্বে আমরা কঠোর গণিত-শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, কি পার্থিব পদার্থ কি অপার্থিব পদার্থ—সকলই—যে-এক নিখিল সমস্তের অন্তর্ভূত, সেই নিখিল সমস্ত হইতে চেতন পদার্থ অপহৃত হইলে শুদ্ধ কেবল অচেতন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে; অতএব ইহা যেমন সুনি-শ্চিত যে, যাহা চতুষ্কোণ নহে তাহা অচ-তুষ্কোণ, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। শ্রী দ্বি]

পরন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন আপনাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন তখন অন্যবিধ আস্তিকগণ যে বাস্তবিক ঈশ্বরকে কি বলিয়া মনে করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান না করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

[সাধারণতঃ সকল আস্তিকই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ; তবে যদি এক আধ জন আস্তিক উহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে তাহার উত্তর আমাদের যাহা দিবার তাহা আমরা যথেষ্টই দিয়াছি। আমরা বারম্বার প্রতি-বাদীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন সত্যের পূর্ণতা হয় না, আর, পূর্ণ সত্যের আশ্রয় ব্যতীত আপেক্ষিক সত্যের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শ্রী দ্বি]

এখন ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উক্তরূপ বিশ্বাসের কোনও যুক্তি আছে কি না তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পাঠক! বোধ করি তোমার পাঁচটী ইন্দ্রিয়

সমুদয়ই আছে। যদি তোমাকে ইন্দ্রিয় কয়টী—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তুমি দর্শন, শ্রবণ আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিবে। কিন্তু জোঁক বা শকুনি যদি কথা কহিতে এবং আমার কথা বুঝিতে পারিত এবং আমি যদি উহাদিগকে কয়টী ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তাহার কি উত্তর প্রাপ্ত হইতাম? জোঁক সম্ভবতঃ বলিত যে, ইন্দ্রিয় তিনটী এবং শকুনি বলিত যে তাহা ৪ টী মাত্র! জোঁক ও শকুনির এমত উত্তর দিবার কারণ কি? বাস্তবিক সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। জোঁকের জ্ঞানে ৩টী এবং শকুনির জ্ঞানে ৪টী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে। তদ্রূপ মনুষ্যের মতেও ৫টী মাত্র ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইহাই কি অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত? পাঠক! তুমি পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় দেখ না বলিয়াই কি নিশ্চয় বলিতে পারে যে কোন ষষ্ঠ বা সপ্তম ইন্দ্রিয় নাই? এখন মনে কর চেতন এবং অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থ মাত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা হইলেই কি তোমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত যে এই দুয়ের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ হইতে পারে না? কোন অতিরিক্ত পদার্থ যে নাই তাহা তুমি কিরূপে অবগত হইয়াছ? তোমার নিজের জ্ঞানই কি জগতের সীমা?

[আমার না হয় পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর এক জনের না হয় দশটা ইন্দ্রিয়; আমার না হয় হিমবিন্দু-পরিমাণ জ্ঞান, আর এক জনের না হয় সাগর-পরিমাণ জ্ঞান; সে কথা এখানে হইতেছে না। এখানে কথা হইতেছে কেবল এই যে, অচেতন চেতন পদার্থ কেবল যে, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, তাহা নহে, তাহা সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য। যেমন, দু-কুড়ি পঞ্চাশ, মাথা নাই মাথা ব্যথা, পরিধি-বিহীন চক্র, সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য, অচেতন চেতন সেইরূপ একটা নিতান্তই অর্থশূন্য অসঙ্গত কথা। কোন এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি একটা কথা বলে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটি আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু এক জন পাগল যদি একটা প্রলাপোক্তি করে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটা কিছু আর আমার বুদ্ধির দোষ নহে, তাহার সে প্রলাপোক্তির ভিতর বুঝিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। একজন দেবতা আসিয়া যদি আমাকে বলেন যে, "আমার পঞ্চাশ ইন্দ্রিয় এবং তাহাতে আমি এত বিচিত্র বিষয় অবলোকন করি যে, তাহা তোমার স্বপ্নের অগোচর; তুমি যদি চাও, তবে তোমাকেও আমি সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারি"; তবে আমি তাঁহাকে বলি যে, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু যদি আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলে যে, আমার ধ্যান-চক্ষু এমনি প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা আমি তমোময় আলোক, অচেতন চেতন, জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে তাঁহাকে আমি বলি যে "এই বই নয়? এ তো অতি সামান্য বিষয়; আমি এক ব্যক্তিকে জানি—তিনি সোণার পাথরে ভাত খা'ন; তিনি হস্ত-পদ-বিহীন অথচ অসি-যুদ্ধে এমনি সুনিপুণ যে, বড় বড় যোদ্ধারা তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; তিনি একেবারেই মূক ও বধির, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত যদি একবার শোনো তবে সেই দণ্ডেই মোহিত হইয়া যাও।" এ সকল কথার কি কোন মাথা

আছে, না মুণ্ড আছে? অচেতন চেতন পদার্থ এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা! আগে একটা কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহার পরে তবে তো তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার হইবে—কিন্তু "অচেতন চেতন" এ কথাটির মূলেই কোন অর্থ নাই;—অতএব মিছামিছি আর কেন! যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন—এই সহজ সত্যটি একজন বালকেও বুঝিতে পারে; আর যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন নহে—ইহা স্বয়ং বৃহস্পতিও বুঝিতে পারেন না—যেহেতু ইহা অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রী দ্বি]

তবে তুমি বলিতে পার যে, চেতন ও অচেতন এই দুইভিন্ন যে কোন তিন হইতে পারে তাহা আমি চিন্তাই করিতে পারি না। তাহা হইলে শকুনিও তো বলিতে পারে যে, চারির অধিক যে ইন্দ্রিয় হইতে পারে তাহা সে চিন্তা করিতেও পারে না। শকুনির এই উক্তি কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

[শকুনি যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান জীব হইত তবে সে এইরূপ বলিত—"আমার পক্ষ আছে বলিয়াই যে, সকল জীবেরই পক্ষ থাকিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; তেমনি আমার চারিটির অধিক ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া যে, সকল জীবেরই সেইরূপ হইতেই হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই; কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, কোন জীবেরই অনিন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এরূপ একটা অবয়ব থাকিতে পারে না—যাহা ইন্দ্রিয়ও নয়—অনিন্দ্রিয়ও নয়। শ্রী দ্বি]

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবগত আছে বলিয়াই শকুনির কথা স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এমন কি কেহ আছে যে, সে চেতন ও অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে?

[যে ব্যক্তি বলে যে, আমি শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া অনুভব করিয়াছি আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত পদার্থ—অচেতন চেতন পদার্থ—দেখিয়াছি, উভয়েরই কথা সমান বিশ্বাস-যোগ্য। যাঁহারা শব্দের কাঙ্গালী কিন্তু অর্থের কোন ধারই ধারেন না, তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অর্থ-শূন্য প্রলাপোক্তি শোভা পায়। শ্রী দ্বি]

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য অনেকই আছে। বাস্তবিক আস্তিকগণই এরূপ মনুষ্য। দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজেই এরূপ অতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বাসকারী আস্তিক। যদি আমি একটী আম্র-অষ্ঠি হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা চেতন না অচেতন? তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে ইহা অচেতন বস্তু। কিন্তু যদি আবার জিজ্ঞাসা করি যে, এই আম্র-অষ্ঠি ভূমিতে রোপণ করিলে যে, তাহা হইতে আম্র-বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা কে উৎপাদন করে? চেতনে? না, অচেতনে? দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার কি উত্তর দিবেন তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

[আমরা তো গত বারেই ইহার উত্তর দিয়া চুকিয়াছি, যথা; বৃক্ষোৎপত্তির মূল কারণ পরমাত্মা—তিনি সচেতন; বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতি—তাহা অচেতন। যিনি চেতন তিনি চেতন—যাহা অচেতন তাহা অচেতন; চেতনও অচেতন নহে—অচেতনও চেতন নহে। শ্রীদ্বি]

তবে এইস্থলে আমরা রামানুজ দর্শনের পদার্থ বিভাগের কথা উল্লেখ করি-

তেছি। রামানুজ মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর। দ্বিজেন্দ্র বাবু রামানুজের এইরূপ পদার্থ বিভাগের কি অর্থ করিবেন? যদি তিনি বলেন যে এইরূপ পদার্থ বিভাগের কোনও ভিত্তি নাই, তাহা হইলে ভরসা করি তিনি এরূপ উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।

[রামানুজের ঐ কথাটি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর ইহার অর্থ আস্তিক মাত্রেই এইরূপ বুঝেন যে, চিৎ কিনা অল্পজ্ঞ জীব-চৈতন্য, অচিৎ কিনা অচেতন জড়-পদার্থ, ঈশ্বর কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ চৈতন্য। মানবী-করণ প্রবন্ধে এ তিনের প্রভেদ আমরা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি, যথা;—অচিৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং; চিৎ—সত্যং জ্ঞানং; ঈশ্বর—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শ্রীদ্বি]

এই তো গেল আস্তিকের কথা। নাস্তিকের মতে চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে কি না? নাস্তিক বাস্তবিক অচেতন অতিরিক্ত কোনও পদার্থই স্বীকার করে না তাহার মতে চেতনা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু চেতন ও অচেতন জড়পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। একই মানবদেহ এক সময়ে চেতন এবং আর এক সময়ে অচেতন পদার্থ বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ অবস্থা যে কেবল জীবন থাকিতে এবং মৃত্যু হইলেই হয় এমত নহে, জীবিত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়েও হইয়া থাকে।

[এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহ মূলেই চেতন পদার্থ নহে—দেহীই চেতন পদার্থ—আত্মাই চেতন-পদার্থ। আর, দেহের যে কোন অবস্থাই হউক্ না কেন—সেই অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই চেতন পদার্থ, সে অবস্থা নিজে চেতন পদার্থ নহে; কেননা অবস্থার সাক্ষী অবস্থাহইতে ভিন্ন। শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু অন্য এক স্থলে "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন" এই বাক্যকে আলঙ্কারিক ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তদুপলক্ষে বলেন যে, "প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, এরূপ আলঙ্কারিক ভাষা এক শোভা পায় কবিতাতে—আর শোভা পায় ঘরাও কথা বার্ত্তায়—এ ভিন্ন বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে তাহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।"

[শুধু যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা নহে, উহার প্রমাণও দেখাইয়াছি; যথা; যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বর অচেতনও নহেন এবং আমাদের ন্যায় অপূর্ণ চেতনও নহেন; কিন্তু ঈশ্বর যে, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে, পরিপূর্ণ চেতন, ইহা তাঁহারা নিজ মুখেই স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার ব্যক্ত করিয়াছেন। তবেই হইতেছে যে, "ঈশ্বর অচেতনও নহেন চেতনও নহেন" এটা কঠোর বৈজ্ঞানিক ভাষা নহে কিন্তু ভাবে বুঝিয়া লইবার ভাষা—আলঙ্কারিক ভাষা। শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বাক্য হইতে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিতেছি যে, ডাঃ ড্রিস্‌ডেল ও মেং প্রকটারের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আর যদি আমরা তাহা সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকি তবে এরূপ ভাষা বিজ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আমরা বিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু বুঝি এবং তত্ত্বজ্ঞান এমন কঠিন বিষয় যে তাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশই করিতে পারে না। অতএব এতদ্রূপ ভাষা বিজ্ঞানের অনুগত কি না তাহা আমরা সত্বরেই

প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলিব না।

আমরা ডাক্তর ড্রিস্‌ডেল এবং মেং প্রক্‌টারের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছি কি না প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। ডাঃ ড্রিস্‌ডেল "প্রোটোপ্লাজ্‌মিক থিওরী অব্ লাইফ" নামক গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ;—"I am content to belive in no God, angel, or spirit, or the immortal soul of man except as made known to us through the miraculous specific revelation' contained in our scriptures. At the same time these beings are of a nature to us wholly incomprehensible and inconceivable. The cardinal doctrines of revealed religion are thus dogmas, not resting on any proofs derived from observation or science at all. These dogmas are also mysteries, not only incapable of scientific proof or disproof, but also above and beyond the comprehension of the human intellect."

এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ অতি কঠিন বোধ হওয়াতে আমরা এস্থলে স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। বাইবলের প্রকাশিত ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর, অথবা প্রেত, বা অমর মানবাত্মা ভিন্ন আমি আর কোনও ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর আদিতে বিশ্বাস করি না। আবার এই সমস্ত ব্যক্তির প্রকৃতি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অবোধ্য এবং অননুভবনীয়। আর বাইবল প্রকাশিত ধর্ম্মের মূল সত্য সকল এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ বা বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোনও প্রমাণের উপর সংস্থিত নহে। এই সমস্ত মত প্রকৃত রূপে এমন রহস্য যাহা যে, কেবল বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত বা অপ্রমাণ হইতে পারে না এমত নহে, তাহা আবার মানব বুদ্ধির অগম্য।

মেং প্রক্‌টার ১৮৮৭ সালের জুলাই সংখ্যা "নলেজ" নামক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠায় আপনাকে এক প্রকার অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া স্বীকার করেন এবং আরো বলেন যে, "A God understood is no God at all" পরিজ্ঞাত ঈশ্বর ঈশ্বরই নহে। এরূপ ভাষাকে সরল ভাব ব্যঞ্জকই বলা যাইবে, না অলঙ্কারযুক্তই বলা যাইবে তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

[ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন—শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন—রামানুজ কি বলিয়াছেন—প্রক্টর তাহার বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ করেন নাই ;—কেনই বা করিবেন! আমরাও প্রক্টর কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করি নাই—করিতে চাহিও না। কোন্ আস্তিক কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া বলা মানবীকরণের উদ্দেশ্যই নহে ; শুদ্ধ কেবল এইটি প্রমাণ করাই মানবীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ বা সর্ব্বজ্ঞ বলিলে মানবীকরণের দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, আর, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন বলা মানবীকরণই বটে ; ড্রিস্‌ডেল-সম্মত বাইবেল শাস্ত্র অনেক স্থানে এইরূপ মানবীকরণ দোষে লিপ্ত হইয়াছে। মানবীকরণ প্রবন্ধের একটিও কোন কথায় প্রভাত বাবু যদি কোন প্রকার যুক্তি-দোষ দেখিয়া থাকেন তবে তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন—তাহার আমরা উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি এ'র ও'র তা'র দোহাই দে'ন কেন? আমরা বীজ-গণিতের নিয়মানুসারে—অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-অনুসারে—দেখাইয়াছি যে, চেতনও নহে অচেতনও নহে=অচেতন চেতন—যাহার কোন অর্থই হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Reductio ad

absurdum অর্থাৎ অর্থ-শূন্য প্রলাপ বাক্যে পরিসমাপ্তি! প্রক্টর বা অন্য কেহ যদি আমাদের এই অকাট্য যুক্তির কোন প্রকার প্রতিযুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে সেই প্রতিযুক্তিটি যে, কি, প্রভাত বাবু নিজেই তাহা আমাদিগকে বলুন না কেন, তাহা হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদেরও যাহা বলিবার আছে আমরা তাহা বলিতে পারি—তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু প্রভাত বাবু সেরূপ কোন প্রতিযুক্তির কথাই উল্লেখ করিতেছেন না—কেবল বলিতেছেন যে, প্রক্টরের মতানুসারে অচেতন চেতন থাকিলেও থাকিতে পারে। গণিত শাস্ত্রীয় অকাট্য যুক্তি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—প্রক্টর প্রভৃতির শুদ্ধ কেবল একটি মুখের কথা প্রভাত বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—এখন জিজ্ঞাসা করি যে, অকাট্য যুক্তি বড় না মুখের কথা বড়? পাঠক কি বলেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এইটিই বিচার-সঙ্গত মনে হয় যে, যুক্তিহীন মুখের কথা অপেক্ষা অকাট্য যুক্তির মূল্য শত সহস্র গুণ অধিক। তবে, প্রক্টর সাহেবের এই যে একটি কথা যে, "A God understood is no God at all" ইহার অর্থ স্বতন্ত্র; ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বরকে আমরা রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না—এ নহে যে, ঈশ্বরকে আমরা সচেতন বলিয়াও জানি না। ক্ষুদ্র বালক অবশ্য পিতার মনের ভাব রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু পিতা যে সচেতন ইহা সে খুবই জানে—ইহাও জানে যে, তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ, আস্তিক মাত্রই জানেন যে, ঈশ্বর সচেতন এবং তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন্ আস্তিক এত বড় একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে উচ্চারণ করিতে—এমন কি মনের এক কোণেও স্থান দিতে—আপনাকে পাপ-ভারে প্রপীড়িত মনে না করেন যে, ঈশ্বরকে আমি রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিয়াছি? আর-একদিকে এইরূপ দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ দে'ন যে, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, Seek and ye shall find, অন্বেষণ কর—পাইবে; ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টে কি মনে হয়? ইহাই মনে হয় যে, পিতার মনের ভাব আমি সমস্তই বুঝি—ইহাই বালকের অনুচিত স্পর্দ্ধাবাক্য; কিন্তু পিতার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা উল্টা আরো বালকের কর্ত্তব্য; এবং যত সে চেষ্টা করিবে ততই তাহার চক্ষু ফুটিবে। এইরূপ, ঈশ্বরকে যতই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব ততই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; এ ভিন্ন, অনন্ত পরব্রহ্মের অন্ত কেহ কখন পায়ও নাই পাইবেও না। অতএব ঈশ্বরকে রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; উহা কেহ করেও নাই করিবেও না—ইহা আস্তিক মাত্রেই করিয়া থাকেন। অতএব ইহা যেমন সত্য যে, A God understood is no God at all, ইহাও তেমনি সত্য যে, A God without knowledge is no God at all.

শ্রীদ্বি]

এখন মনে করা যাউক যে ডাঃ ড্রিস্ডেল এবং মেং প্রকটারের ভাষা আলঙ্কারিকই বটে। তাহা হইলে আমরা যে, ঈশ্বরকে চেতন এবং অচেতন ইহার কিছুই নহে বলিয়াছি তাহা বিজ্ঞান অনু-

গত কি না সে বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। এই কথা হইতে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে। ১। বিশিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলে? এবং ২। কি বিষয়ের জ্ঞান? হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মতে "সামান্য জ্ঞানের উচ্চতর বিকাশের নাম বিজ্ঞান।" এই সংজ্ঞাও পরিস্কার রূপে বুঝিতে হইলে "সামান্য জ্ঞান" এবং "উচ্চতর বিকাশ" এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। সামান্য জ্ঞান বলিতে এমত জ্ঞান বুঝা যায়, যাহা কোন বস্তু দর্শনে সহসাই উদিত হয়। যথা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করিলে সহসা এই প্রতীতি জন্মে যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই সামান্য জ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান নহে। কারণ ইহা প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী এত বৃহৎ এবং সূর্য্য এত দূরবর্ত্তী যে উহাদিগকে পরীক্ষার অধীন করিয়া উক্ত সামান্য জ্ঞানকে বিকসিত করা সহজ কার্য্য নহে। এজন্য এস্থলে কেবল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই এই সামান্য জ্ঞানকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই প্রমাণ এই ঃ—গ্রহ ও নক্ষত্রগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যহ উদিত এবং অস্তগত হয়। এই হেতু গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ সূর্য্যের পর্য্যটনের প্রমাণ মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে, কেবল পৃথিবীকে দৈনিক প্রদক্ষিণ করে এমত নহে উহারা বাস্তবিক বার্ষিকও পরিবেষ্টন এবং তদতিরিক্ত গ্রহগণ আবার স্থির নক্ষত্র মধ্যে নানা রূপ বিশৃঙ্খল ভাবে পর্যটন করিয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের এতদ্রূপ গতির সহিত সূর্য্যের পরিভ্রমণের তুলনা করিলে আর পৃথিবীকে সূর্য্যের দৈনিক প্রদক্ষিণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারে না। তখন ইহা পরিশোধিত হইয়া এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে, পৃথিবীই ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। ইহারই নাম বিশিষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত জ্ঞান, সুতরাং তখন উহা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া দাঁড়ায়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন্ বিষয়ের জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান? যখন সামান্য জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা পরিশোধিত হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হয়, তখন তাহা এমত বিষয়ের হওয়া চাই, যাহার উপর পরীক্ষা ও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থই পরীক্ষণীয় ও প্রমেয় বস্তু। অতএব জড় পদার্থের জ্ঞানই বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক এক মাত্র জড় পদার্থই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু জ্ঞান আমরা উপলব্ধ করি তাহা জড় পদার্থের মাত্র। এজন্য আমরা কোনও কথাই চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি না যাহা এ জড় জগতে কদাপি দর্শন আদি করিতে পারি নাই।

[আমি স্বচ্ছন্দে চিন্তা করিতে পারি যে, প্রভাত বাবু আমার লিখিত এই কথাটি বুঝিতেছেন; অথচ, জড় জগতের কোন স্থানেই আমি বোধক্রিয়ার চিহ্ন মাত্রও দেখি নাই—চেতন রাজ্যেই আমি বুদ্ধি ক্রিয়া উপলব্ধি

করিয়া থাকি। সভ্য মনুষ্য-মাত্রেই বারো আনা অংশ চেতন লইয়াই ব্যাপৃত থাকে—কেননা তাহার পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই চেতন-পদার্থ। জন-শূন্য উপদ্বীপের রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো—যাঁহার ত্রিসংসারে কেহই ছিল না, তিনিও মানব-চেতনের জন্য হাহাকার করিয়া কাল-যাপন করিতেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, মনুষ্যের চিন্তা শুদ্ধ কেবল জড়জগতেই আবদ্ধ। প্রভাত বাবু বলিতে পারেন যে, লোকের কথাবার্ত্তা শুনিলে এবং কার্য্যাদি দর্শন করিলে তবেই আমরা তাহাদের বুদ্ধি-ক্রিয়ার পরিচয়-প্রাপ্ত হই ;—কিন্তু কথা-বার্ত্তা মুখের বায়ু-মাত্র ও আচার ব্যবহার অঙ্গ-চালনা মাত্র, সুতরাং দুইই জড়জগতের অন্তর্গত। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমাদের নিজের নিজের বুদ্ধি-ক্রিয়াকে চেতন-রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি না করিতাম তবে অন্যের বুদ্ধি-ক্রিয়া আমাদের ধ্যানের অগোচর হইত। অতএব বুদ্ধি-ক্রিয়াকে যখন আমরা আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, তখন চেতনরাজ্যেই তাহাকে আমরা উপলব্ধি করি। বুদ্ধি-ক্রিয়া তো দূরের কথা—সামান্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও চেতন-জগতের অন্তর্গত ; ধর যেন—উত্তাপ ; উত্তাপ অবশ্য জড়জগতেরই অন্তর্গত ; তাহা এক প্রকার আণব (Molicular) গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে—সুতরাং তাহা ভৌতিক ক্রিয়া; কিন্তু উত্তাপ যেমন ভৌতিক ক্রিয়া উত্তাপের অনুভবও কি সেইরূপ ভৌতিক ক্রিয়া ? কখনই না—উত্তাপের অনুভব এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া সুতরাং তাহা চেতন-জগতেরই অন্তর্গত। শ্রীদ্বি]

যদি সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধ শূন্য হয়, তবে তাহা সামান্য জ্ঞান এবং কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধ-যুক্ত হইলেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত।

এখন ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই বাক্যটী বিজ্ঞানের অনুগত কি না আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জগতে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ পদার্থ মাত্র বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি চেতনের স্বাধীন বিদ্যমানতা কে দর্শন করিয়াছে ? তাহা কি অচেতন জড় পদার্থের আশ্রয় ভিন্ন স্বাধীন অবস্থায় দর্শন করিতে পারা যায় ? যদি উহা জড় পদার্থে ভিন্ন স্বাধীন ভাবেই দৃষ্টিগোচর না হয় তবে তাহা যে জড় পদার্থেরই গুণ নহে ইহা কে প্রতিপাদন করিতে পারে ? বস্তুত্বের লক্ষণ কি ? যাহা এখন আছে, পরক্ষণে নাই, পরে আবার দেখা দেয় এবং পুনরায় অন্তর্হিত হয় তাহাকে কি বস্তু বলা যাইতে পারে ? যথা, বীণা যন্ত্রের ধ্বনি। তাহা এই উৎপন্ন হইল, এই রহিত হইয়া গেল, আবার উৎপন্ন হইল এবং পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হইল। এরূপ ধ্বনি কি বাস্তবিক কোন বস্তু, না তাহা ক্রিয়াবিশেষের প্রকাশিত ফল। বিজ্ঞান মতে ইহা ক্রিয়াবিশেষের ফলই বটে। পাঠক ! এখন চিন্তা করিয়া দেখ দেখি বীণাধ্বনির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি না ? চৈতন্য এই আছে, এই নাই, আবার আসিল এবং পুনরায় অন্তর্হিত হইল ; এতদ্রূপ পুনঃ পুন বিনাশশীল চৈতন্য কি স্বাধীন বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? ইহা কি ধ্বনির ন্যায় ক্রিয়া বিশেষের ফল নহে।

[কালিকের বীণা ধ্বনি ভিন্ন, এবং আ-

জিকের বীণাধ্বনি ভিন্ন; কিন্তু যে প্রভাত বাবু প্রথম সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক, সেই প্রভাত বাবুই তৃতীয় সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক—প্রভাত বাবু একই প্রভাত বাবু; পাঠক কি বলিবেন যে, না তাহা নহে—কালিকের তোপধ্বনি যেমন আজিকের তোপধ্বনি নহে, তেমনি কালিকের সে প্রভাত বাবু আজিকের এ প্রভাত বাবু নহে? কল্যও আমি সুখে ছিলাম—অদ্যও আমি সুখে আছি; অদ্যকার সুখের অবস্থা কল্যকার সুখের অবস্থা হইতে ভিন্ন, কেননা, কল্যকার সে সুখ অদ্যকার এ সুখ নহে; কিন্তু অদ্যকার আমি কল্যকার আমি হইতে ভিন্ন নহি, কেননা কল্যকার সেই আমিই অদ্যকার এই আমি। "আমার বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী-স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা কি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন? না ধ্রুব পদার্থের ন্যায় সকল মুহূর্ত্তেই একই অভিন্ন?" এ কথা পাঠককে জিজ্ঞাসা করাও যা', আর, এ কথাও তা, যে"আমার কি জিহ্বা আছে—না মূলেই আমার জিহ্বা নাই?—একবার দেখ তো হে বাপু!" যদি আমার জিহ্বা না থাকিত তবে আমি ও-কথাটি উচ্চারণ করিতেই পারিতাম না। প্রভাত বাবুর সাক্ষী চৈতন্য যদি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন হইত, তবে কে-ই বা পাঠককে প্রশ্ন করিতেছে—কাহাকেই বা পাঠক উত্তর প্রদান করিবেন? পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের প্রভাত বাবুই প্রশ্ন করিয়াছেন; পর-মুহূর্ত্তের আর-এক প্রভাত বাবুকে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া ফল কি? যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকে উত্তর প্রদান করাই তো বিধেয়! ইহাকেই বলে Reductio ad absurdum! আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানের মূল প্রদেশে এরূপ কতকগুলি সত্য রহিয়াছে যাহা একেবারেই অকাট্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়—যেমন পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—পরিপূর্ণ সত্য অপূর্ণ সত্যের আশ্রয়—ইত্যাদি; সুতরাং জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ মূল প্রদেশটি পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহা জানে না। জ্ঞানের প্রান্ত-স্থানীয় শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাই পরিবর্ত্তনশীল—কিন্তু জ্ঞানের কেন্দ্র-স্থানীয় আত্মা অটল এবং অপরিবর্ত্তনীয়; যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের কেন্দ্র যেখানকার সেইখানেই থাকে, কিন্তু তাহার পরিধির প্রত্যেক অংশ ক্রমাগতই স্থান পরিবর্ত্তন করে—উহাও সেইরূপ। প্রভাত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীব-চৈতন্য স্বাধীন কি না? ইহার উত্তর এই যে, জীব-চৈতন্য কোন্ অংশে স্বাধীন কোন্ অংশে পরাধীন—ইহা প্রতি মনুষ্যেরই আপনি বুঝিবার কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে; লোহার সিন্ধুকের মধ্য হইতে টাকা বাহির করিয়া দর্শনার্থী ব্যক্তিকে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতাকে বক্ষ চিরিয়া বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না; তবুও যদি বল যে, আত্মার স্বাধীনতার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এইরূপ যথা;—আপনার অধীনতাই স্বাধীনতা, অন্যের অধীনতাই পরাধীনতা; পরাধীনতা জড়জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাধীনতা জড়জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না;—তবে "স্বাধীনতা" এ কথা আমরা পাইলাম কোথা হইতে? অবশ্য আমরা আপনার অভ্যন্তরে কোন না-কোন-প্রকার স্বাধীনতার ভাব উপলব্ধি করি, তাই সেই ভাবটি অন্যের নিকটে জ্ঞাপন করিবার জন্য "স্বাধীনতা" এই শ-

ব্দটি ব্যবহার করি। "আমি আপনি যাহা বুঝি—তাহা আমি প্রভাত বাবুকে বুঝা-ইব" আমি আপনিই এইরূপ একটি নিয়ম স্থির করিয়াছি এবং আমার আপনার সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি অদ্যকার এই প্রস্তাবটি লিখিতেছি;—তাই আমি বলি যে, আমি স্বাধীনভাবে লিখিতেছি। কিন্তু এক অংশে যেমন আমি স্বাধীন—আর এক অংশে তেমনি আমি পরাধীন; দোয়াত কলম না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—আমার শরীর সুস্থ না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—ইত্যাদি। অতএব, স্বাধীনতার ভাব আমি আপনার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমি জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি;—কোন আপেক্ষিক সত্যই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে সুতরাং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে; পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। শ্রী দ্বি]

ধ্বনির সহিত চৈতন্যের সাদৃশ্য যে এই স্থলেই শেষ হইয়াছে এমত নহে। ধ্বনির উৎপত্তি জন্য যেরূপ বীণা এবং বাদক আবশ্যক, চৈতন্যের উদ্রেক জন্যও মস্তিষ্ক এবং আলোক আদি উত্তেজন আবশ্যক। ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞানেরই কথা, কল্পনার কথা নহে। মস্তিষ্কই যে বাস্তবিক চৈতন্যের যন্ত্র ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া আমরা ডাং ফেরিয়ার কৃত "মস্তিষ্কের ক্রিয়া" নামক গ্রন্থের ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত স্বতঃসিদ্ধ। দ্ব্যর্দ্ধ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে যে চৈতন্যের কোনও অবস্থার স্বাতন্ত্র্য আছে এমত প্রমাণ নাই। পরন্তু কোন কিছু যে (মস্তিষ্কে) অতিরিক্ত সংযুক্ত আছে অথবা সরলতম স্নায়বিক যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে যে বাল্কল (cortical) কেন্দ্র সকলের ক্রিয়ার কোন পার্থক্য ভাব আছে তাহাও বিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কিন্তু সরলতম প্রতিক্ষেপিকা ক্রিয়া এবং জটিলতম মানসিক কার্য্য মধ্যে যে ধারাবাহিক অচ্ছিন্ন প্রকার (gradation) আছে তাহারই বরং প্রমাণ পাওয়া যায়।"

[মস্তিষ্ক যে একটা যন্ত্র, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু মস্তিষ্ক কাহার যন্ত্র? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন—যন্ত্রী যন্ত্র হইতে ভিন্ন। আলোক কাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য আলোক এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। সরলতম স্নায়বিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা, আর, জটিলতম কৈন্দ্রিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা? না সাক্ষী-চৈতন্য; সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য স্নায়বিক এবং কৈন্দ্রিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। অতএব প্রভাত বাবু ঐ সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষী চৈতন্যকে জড়াইয়া ঝোলে অম্বলে মিশাইবেন না। শ্রী দ্বি]

আলোক আদির উত্তেজন ব্যতীত যে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। আমাদের শারীরিক প্রকৃতি এরূপ দেখা যায় যে, কিছু কাল পরিশ্রম করিলে শ্রমশক্তি ক্রমে লাঘব হইতে থাকে, অবশেষে এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। তখন সমুচিত কাল বিশ্রাম না করিলে আর শ্রমক্ষম হইতে পারা যায় না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, বিশ্রাম দ্বারা স্নায়ু ও মাংসপেশীতে

এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত শক্তির বিকাশ প্রভাবেই পরিশ্রম করিতে পারা যায় এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার ক্ষয় হইলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। (শারীর বিধান বিদ্যা মতে পরিশ্রম দ্বারা এক প্রকার ক্লান্তিজনক পদার্থও মাংসপেশীতে উৎপন্ন হইয়া পরিশ্রম-শক্তি লাঘব হয়। সুতরাং ক্লান্তিজনক পদার্থের উৎপত্তিও পরিশ্রম-শক্তি লাঘবের এক উপাদান।) চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চেতনা থাকিলে চিন্তা শক্তির কিছু কিছু চালনা হয়ই হয়। তদ্ধেতু সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, নিদ্রিত হইয়া সমুচিত বিশ্রাম না করিলে সুবিধা ও শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করা দূরে থাকুক দীর্ঘকাল জাগ্রৎ থাকিতেও পারা যায় না। এই হেতু চিন্তা করিবার এবং চেতন থাকিবার জন্যেও মস্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ প্রকার শক্তি সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ পেশী মধ্যে ক্লান্তিজনক পদার্থ জন্মে মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সেইরূপ কোন পদার্থ মস্তিষ্ক মধ্যে উৎপন্ন হয় এমত প্রমাণ নাই। অতএব কেবল মস্তিষ্কের শক্তিক্ষয়ই চিন্তা ও চেতনা শক্তি লাঘবের একমাত্র কারণ।

[অত কথা না বলিয়া এক কথায় বলিলেই হয় যে, শরীর ভাল থাকিলেই চিন্তাশক্তি রীতিমত স্ফর্ত্তি পাইতে পারে। কিন্তু বাহ্য বস্তুও যেমন—মানসিক চিন্তাও তেমনি—উভয়ের কোনটিই সাক্ষী চৈতন্য নহে; হস্তীও আমি নহি—হস্তিচিন্তাও আমি নহি; শরীরও আমি নাহি—শরীরচিন্তাও আমি নহি, তবে কি? না সেই সকল বস্তুর এবং সেই সকল চিন্তার সাক্ষী পুরুষই আমি-শব্দের বাচ্য। সাক্ষী চৈতন্য সাদা বস্তু দেখিবার সময় সাদা হয় না—কালো বস্তু দেখিবার সময় কালো হয় না; দুই বস্তু দেখিবার সময় দুই হয় না—তিন বস্তু দেখিবার সময় তিন হয় না; সাক্ষী চৈতন্য হস্তি-চিন্তার সময়েও হস্তী হয় না—অশ্ব-চিন্তার সময়েও অশ্ব হয় না; বস্তু-বৈচিত্র্যে সাক্ষী-চৈতন্যের বৈচিত্র্য হয় না; সুতরাং চিন্তার হ্রাস বৃদ্ধিতে সাক্ষী চৈতন্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাক্ষী চৈতন্য আপনার সতেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী—নিস্তেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী। নিদ্রাকর্ষণের সময় তো চিন্তাশক্তি খুবই নিস্তেজ হয়, কিন্তু তখনও সাক্ষী চৈতন্য এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থায় প্রবেশ করিয়া পরম সুখ উপলব্ধি করে; এই জন্যই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মুখে এ কথা শোভা পায় যে, "কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"; কারণ, নিদ্রাকালে যদি সে ব্যক্তি পরম সুখের অবস্থা উপলব্ধি না করিত, তবে পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্তটি কখনই তাহার স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতে পারিত না; কেননা পূর্ব্বে যে-বিষয় সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয়ই কেবল পশ্চাতে স্মরণে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির যখন দিব্য স্মরণ হইতেছে যে, কল্যরাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন নিদ্রাকালে সে সুখ অবশ্যই তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। আমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রভাত বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছি—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত সময়ে (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) বাস্তবিকই আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এইরূপ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই যে একটি

বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে যে, কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে নিদ্রাকালে সে ব্যক্তি (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) পরম সুখ অনুভব করিয়াছিল। অতএব নিদ্রাবস্থায় যখন চিন্তা-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—সাক্ষী চৈতন্য তখনকারও সুখাবস্থার সাক্ষী—সুতরাং সে আপনি সে-অবস্থা হইতে ভিন্ন। সাক্ষী চৈতন্য নিজে জাগ্রদবস্থাও নহে, স্বপ্নাবস্থাও নহে, সুষুপ্তি অবস্থাও নহে—পরন্তু তিন অবস্থারই সাধারণ সাক্ষী। শ্রীদ্বি]

মাংসপেশী ও মস্তিষ্কে যে শক্তি সঞ্চয়ের উল্লেখ করা গেল সেই সঞ্চিত শক্তি বাস্তবিক কিরূপ তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অনুক্ষণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। এই দ্বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত এবং প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু হইতে অম্লযান গৃহীত হয়। * পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিদ্রাকালে যে পরিমাণ (মুক্ত ও মিশ্রিত) অম্লজান নিঃশ্বাস যোগে বহির্গত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রশ্বাস যোগে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গৃহীত অতিরিক্ত অম্লজান শোণিত আদিতে সঞ্চিত থাকে। সেই সঞ্চিত অম্লজান শারীর পদার্থের সহিত রাসায়নিক আদিরূপে মিশ্রিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। সেই উৎপন্ন তাপই বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার শারীর শক্তির মূল। এ জন্য যদি কোন কারণবশতঃ অম্লজান গ্রহণের ব্যাঘাত হয় তবে শারীর ক্রিয়া এবং মানসিক কার্য্য সমুদয়েরই ব্যত্যয় জন্মে। এই হেতুই পীড়া বিশেষে মানসিক বিকার এবং প্রলাপ আদিও হইতে দেখা যায়।

[নিশ্বাস প্রশ্বাসজ উত্তাপ ব্যতিরেকে শরীর কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া সে উত্তাপকে সাক্ষী চৈতন্য বলা যাইতে পারে না; কে তবে সাক্ষী চৈতন্য? না সেই উত্তাপের ফলভোক্তা—সেই উত্তাপের উপলব্ধিকর্ত্তা—সেই উত্তাপের জ্ঞাতা। শ্রী দ্বি]

জীব-শরীরে দুই প্রকার পদার্থ আছে। মৃত এবং জীবিত। যথা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থ শ্বেত ও ধূসর পদার্থ। শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শারীর মৃত এবং জীবিত পদার্থের সহিত এক দিকে কাষ্ঠ ও দহনোৎপন্ন জল আদি এবং অন্য দিকে অনলের তুলনা হইতে পারে। যখন কাষ্ঠস্থিত ইন্ধন বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণশীল অবস্থার নাম অনল। উক্ত মিশ্রণ সমাপ্ত হইয়া যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা জল আদি। এস্থলে কাষ্ঠ ও জলকে মৃত এবং অনলকে জীবিত বলা যাইতে পারে। কারণ শারীর মৃত পদার্থ সকল কাষ্ঠ বা জলের ন্যায় শরীরান্তর্গত বিশেষ প্রকার মিশ্রণ কার্য্যের পূর্ব্ব এবং শেষ এবং দৈহিক জীবিত পদার্থ অনলের ন্যায় সেই বিশেষ প্রকার মিশ্রণশীল অবস্থা। আর

* প্রভাত বাবু এখানে একটি শব্দের ভুল করিয়াছেন; নিশ্বাস না লিখিয়া তিনি নিঃশ্বাস লিখিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই নিঃশ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাষায় নিঃশ্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। নির্ব্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত বটে কিন্তু নিবাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষার নিঃ = লাটিন ভাষার ex; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নি = লাটিন ভাষার in। নিশ্বাস-কিনা inbreathing। সংস্কৃত ভাষার প্র = Latin ভাষার pro = ইংরাজি ভাষার forth; প্রশ্বাসকিনা প্রক্ষিপ্ত propelled শ্বাস—breathing forth; অতএব, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই প্রশ্বাস। শ্রী দ্বি]

যেরূপ দহন হইতে তাপ উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন কাষ্ঠকেও দগ্ধ অর্থাৎ দহনে পরিবর্ত্তিত করে, সেইরূপ জৈবনিক মিশ্রণ হইতেও বিশেষ প্রকার বল উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন মৃত পদার্থকে জীবিত পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনলে যেরূপ সদৃশ অনল উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করে, শারীর জীবিত পদার্থেও সেইরূপ সদৃশ জীবিত পদার্থ উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব অনল এবং জীবিত পদার্থ উভয়েই বিশেষ বিশেষ বলের আকর। কিন্তু কাষ্ঠ এবং মৃত পদার্থে বিশেষ বিশেষ প্রকার বল আবদ্ধ থাকিলেও উহারা অনল ও জীবিত পদার্থের ন্যায় বলশালী নহে।

[প্রভাত বাবু এতগুলা কথা কি উদ্দেশে বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয় যে, ধূসর পদার্থই সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা, তবে তাঁহার সে কথায় আমরা কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না। আমরা বলি যে সেই ধূসর পদার্থের জৈবনিক কার্য্যের ফলভোক্তাই আত্মা; কেননা ধূসর পদার্থ নিজে কিছু আর তাহার নিজের কার্য্যের ফল-ভোগ করে না। শ্রীদ্বি]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শ্বেত পদার্থ আবার সূত্রাকৃতি। সূত্র সকল স্নায়বীয় কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে পারিধ (peripheral) প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। স্নায়বীয় সূত্র সকল আবার অল্প অল্প দূর অন্তর জীবিত ধূসর পদার্থের পুঞ্জ সম্বলিত। ইহাতে স্নায়বীয় বল চালনার এই সুবিধা হয়ঃ—কোন স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইলে তাহা প্রবাহমান হইতে থাকে আর বাহক সূত্রের মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থ পুঞ্জ সকল হইতে বল গ্রহণ করিয়া ক্রমে পোষিত হইতে হইতে চলিতে আরম্ভ করে। এখন মনে কর তোমার হস্তাঙ্গুলিতে আমি চিমটি কাটিলাম। ইহাতে চিমটির স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইল। সেই বল স্নায়ুযোগে প্রবাহিত হইয়া বোধ-গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে যাইয়া কার্য্য করিল তাহাতে তথায় আর একটী বল উৎপন্ন এবং অঙ্গুলিতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিমটির উত্তেজনা হইতে অপসারিত করিল। এস্থলে যদি তুমি জাগরিত থাক তবে সেই বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার। কিন্তু যদি তুমি নিদ্রিত থাক তবে উক্ত বল তোমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্গুলীকে চিমটি হইতে অপসৃত করিবে। যদি ভেকের মস্তিষ্ক ফেলিয়া দিয়া এই পরীক্ষাটী করা যায়, তবে আমাদের এই উক্তি আরো বিশদ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ, পরিচালনা ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেতনা আবশ্যক নহে।

[প্রভাত বাবু এইমাত্র বলিলেন যে "যদি তুমি জাগরিত থাক তবে তোমার বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার।" তাই আমরা বলি যে, স্নায়বিক কার্য্যের উপর আমাদের ঐ যে কর্ত্তৃত্ব—উহা স্নায়ু যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে, কিন্তু স্বয়ং সাক্ষী চৈতন্যের। নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিতে

পারে; এ ভিন্ন, স্বকার্য্য করা না করা কোন যন্ত্রেরই কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব যাহার আছে, তাহা স্নায়বীয় যন্ত্র নহে কিন্তু স্নায়বীয় যন্ত্রের যন্ত্রী—সাক্ষী চৈতন্য আত্মা। শ্রীদ্বি]

যে চৈতন্য স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ করে তাহা বাস্তবিক কিরূপ দ্রব্য এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। বিজ্ঞান মতে বলের (তাহা তাপাদির আকারেই হউক, বা সামান্য জড় কণিকার গতিরূপেই হউক) কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন বস্তুর গতি জন্মিতে পারে না। এবং কোন গতি উৎপন্ন হইলে তাহা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চিমটি কাটার দরুণ যে বল উৎপন্ন হইয়া স্নায়ু যোগে মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবেই জড়ীয় গতি।

[এইরূপ জড়ীয় গতি ভৌতিক রাজ্যেই দেখা গিয়া থাকে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঘড়ির নিজের চলা-ফেরা'র উপরে যেমন তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃতির নিজের জড়ীয় গতির উপরে তেমনি প্রকৃতির নিজের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; আত্মাই কেবল প্রকৃতির গতি'কে অভীষ্ট পথে নিয়মিত করিতে পারে। শ্রী দ্বি]

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

শ্রেয় প্রেয় নাম, পুণ্য পাপ ধাম, দুটী পথ বিদ্যমান।
প্রেয় পরিহরি, শ্রেয় পথ ধরি, সাধুজন তা'তে যান॥

এ ঘোর সংসারে, মোহের পাথারে,
যবে তুমি দিশাহারা।
বিষম তুফানে, যাইতে উজানে,
হয়েছিলে প্রায় সারা॥

হেন দুরদিনে, তোমা দীন হীনে,
কে চাহিল দয়া করি।
পদতরী দিল, কূল দেখাইল,
উদ্ধারিল দয়া করি॥

পাপীর শরণ, অধম তারণ,
দয়াময় তিনি হ'ন।
পাপীরে তারিতে, শুভ মতি দিতে,
কত তাঁর আকিঞ্চন॥

প্রেয় বিনা সার, না ছিল তোমার,
মাতিলে বিষয় রসে।
জীবন ধারণ, কর কি কারণ,
ভুলিলে মায়ার বশে॥

অমৃতের কথা, সে পথ বারতা,
না শুনিলে তুমি কানে।
যিনি প্রেমদাতা, পিতা মাতা পাতা,
চাহিলে না তাঁর পানে॥

শ্রেয়ের সোপান, মঙ্গল নিদান,
কে তবে দেখায়ে দিল।
"পাপেতে মগন, আত্মার নিধন,"
কানে কানে কে বলিল॥

"কেন এলে ভবে, কোথা যে'তে হবে"
কে তোমারে সুধাইল।
"লইয়া জঞ্জাল, কেন হর কাল"
কে তোমারে প্রবোধিল॥

যে চাহেনা তাঁরে, ভোলে আপনারে,
পাপেতে অসাড় হিয়া।
তারেও ফেরান, হৃদয় গলান,
অনুতাপ অশ্রু দিয়া॥

তিনি অনুক্ষণ, করেন চেতন,
পাপীর হৃদয়ে আসি।

তিনি না শোধিলে, কৃপা না করিলে,
বাড়িত পাপের রাশি ॥

মোরা অভাজন, তবু কদাচন,
ত্যাজ্য পুত্র নহি তাঁর।
কাছেতে ডাকিয়া, মলা মুছি দিয়া,
কোল দেন আপনার ॥

পাপেরে রোধিতে, সুমতি পালিতে,
কর দেখি তুমি পণ।
অমনি সে পণ, করিতে রক্ষণ,
তিনি দেন সুঘটন ॥

শ্রেয়েতে চলিতে, পর্ব্বত লঙ্ঘিতে,
প্রয়োজন যদি হয়।
তাহাও পারিবে, অসাধ্য সাধিবে,
ঘুচাবেন তিনি ভয় ॥

তাঁহারে ছাড়িলে, সংসারে সেবিলে,
ফাঁপরে পড়িবে হায়।
মৃগ তৃষ্ণিকায়, বল কে কোথায়,
অমৃতের কণা পায় ॥

ক্রমশঃ।

—০—

সমালোচন।

Philosophy of the Bhagavadgita. A Lecture by Baboo Radhanath Basak B. A.

গীতা-তত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসাক বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকার এই বক্তৃতাটীতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সারার্থ বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া গীতার ভাব সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও তৎসঙ্গে spiritual culture অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকটিত আছে তাহাতে তাঁহার ভক্তি প্রবণতা, সহৃদয়তা, ও পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে গাঢ়াভিনিবেশ দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইলাম। পাঠকদিগের তৃপ্তিসাধন জন্য আমরা ঐ প্রবন্ধ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

From the commencement of spiritual culture, with the first glimpse of faith, to the state of constant communion with God, there are clearly two peculiar phases ; to external appearance the first is a busy life ; the second a comparatively secluded life. In regard to the internal state, the first shows the state of war with passions, their subjugation, the predominance of the highest motives in the performance of works tending to the welfare of men in general, a view of all mankind with an equal eye in regard to the relationship of God as Father, and a state of increasing happiness in consequence of internal peace. The second shows constant equanimity of mind and entire devotion to God. During the whole period of these stages, there is only one force at work—that of faith, holding God always in view. Man has to do nothing more than to leave himself to God, and then God does the rest in drawing man towards Himself.

ইহার মর্ম্মার্থ এই। সাধনের প্রথমাবস্থায় আত্মাতে নিকৃষ্ট রিপুদিগের সহিত সংগ্রাম—দেবাসুরের যুদ্ধ ক্রমে রিপুগণের উপর প্রভুত্ব, ঈশ্বরে একান্ত মতি, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন অনুরাগ তৎপরে শান্তি ও আনন্দ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। নির্ভরের অবস্থায় সাধক আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি একান্তে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে অলক্ষিতরূপে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন ও আপনার অমৃত ধামে স্থান দেন।

সুরাপান বা বিষপান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রণীত।

গ্রন্থকার সুরাপানের বিষময় ফল বিস্তারিতরূপে বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গীয় জনসমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সুরাপান দ্বারা মানুষের কাইক মানসিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কত প্রকার বিজাতীয় ঘোরতর অনিষ্ট হয়, মানুষ কিরূপ মনুষ্যত্ব হীন পশুবৎ হইয়া যায়, দেশ বিদেশ উৎপন্ন অনেক বাস্তব ঘটনা উদাহরণ দিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুরাপান যে বাস্তবিক বিষপান তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ। তাঁহার গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সমাদরে রক্ষিত হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

———

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প

অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ১৮৭৬ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত চারি বৎসরের পত্রিকা অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিম ১২৲ টাকা; পশ্চাদ্দেয় ১৬৲ টাকা।

১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সুপ্রসিদ্ধ সভ্যগণ ৪ বৎসর ধরিয়া যে সকল তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন সেই সকল, এবং তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে দেশ দেশান্তরবাসী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে যে সকল তত্ত্বের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে বিবৃত হইয়াছে। এদেশের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রথম সময়ের সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পে আছে।

এই কল্প এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক ব্যক্তি এতদন্তর্গত কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ পৃথক্ মুদ্রিত করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অভীষ্টমত ফল হইবে না ভাবিয়া আমরা সমুদায় কল্পটী পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কল্পের কয়েক খণ্ড ৫০ টাকা করিয়া মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতনমুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উপরোক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ইহাতে অনেক চিত্র, মানচিত্র এবং পারসী প্রভৃতি অক্ষরের আবশ্যক হওয়াতে ইহার মূল্য এতদপেক্ষা আর কমাইতে পারা গেল না। কলিকাতার গ্রাহকেরা মাসিক এক টাকা কিম্বা ত্রৈমাসিক তিন টাকা করিয়া দিলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতদতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এইরূপে অগ্রিম মূল্য ৫৲ দান করিয়া গ্রাহকেরা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। যাঁহারা ১২ টাকা একবারে দিবেন, তাহাদিগকে সাহায্যকারী স্বরূপ গণ্য করা যাইবে। তাঁহাদিগকে সমস্ত পুস্তক একত্রে বাঁধাইয়া দেওয়া যাইবে।

আমার নামে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। } শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী। কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৪ সংখ্যা | ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

মানবীকরণই বটে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি চৈতন্য না থাকে তবে সেই গতি নিবন্ধন মস্তিষ্কের সঞ্চার-বিশেষ হইতেই আর একটী গতি উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি চৈতন্য থাকে তবে উক্ত দ্বিতীয় গতি মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে এবং না হইতেও পারে।

[অতএব প্রমাণ হইল যে, এরূপ কর্ত্তৃত্ব চৈতন্যেরই কর্ত্তৃত্ব—স্নায়ু-যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে। কেননা, কোন যন্ত্রই আপনার গতিকে আপনি নিয়মিত করিতে পারে না; এক কেবল চৈতন্যই তাহা পারে। শ্রীদ্বি]

গতি যদি উৎপন্ন হয় তবে কিসে তাহা উৎপন্ন হয়? প্রথম গতিতে? না, চৈতন্যে? যদি প্রথম গতিতেই দ্বিতীয় গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হয়। আর যদি চৈতন্যের প্রভাবে গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? বিজ্ঞান মতে কোন জড় পদার্থ একবার গতিবিশিষ্ট হইলে যে পর্য্যন্ত অন্য কোন জড় বস্তু আসিয়া তাহা গ্রহণ না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহা গমনই করিতে থাকিবে এবং কোন গতির কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন জড়ের গতি উৎপন্ন হইতেও পারে না। সুতরাং চৈতন্য যদি কোন জড়াতীত ব্যক্তিই হয়, তবে তাহা যে কিরূপে প্রথম গতি রহিত করিয়া দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করে ইহা চৈতন্যবাদীরাই বলিতে পারেন, বিজ্ঞানে বলিতে পারে না।

[প্রভাত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি কিরূপে আরএকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়—এই সোজা বৃত্তান্তটিও বিজ্ঞানে বলিতে পারে কি? আর, বিজ্ঞানে তাহা বলিতে পারে না বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি আরেকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হইতে পারে না? আশ্চর্য্য ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি স্পেন্সর কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হৌক্;—

"It is an established mechanical truth that if a body moving at a given velocity

strikes an equal body at rest in such wise that the two move on together, their joint velocity will be but half that of the striking body. Now it is a law of which the negative is inconceivable that in passing from any one degree of magnitude to another all intermediate degrees must be passed through, or in the case before us, a body moving at velocity 4 cannot by collision, be reduced to velocity 2, without passing through all velocities between 4 and 2. But were matter truly solid—were its units absolutely incompressible and in unbroken contact—this "law of continuity" would be broken in every case of collision. For when of two such units, one moving at velocity 4 strikes another at rest, the striking unit must have its velocity 4 instantaneously reduced to velocity 2; must pass from velocity 4 to velocity 2 without any lapse of time, and without passing through intermediate velocities; must be moving with velocities 4 and 2 at the same instant, which is impossible." ইহার ভাবার্থ এই ;

বিজ্ঞানের একটি স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, একই ওজনের দুইটি গোলা যদি ঐকান্তিক নিরেট হয় অর্থাৎ যদি কোন অংশেই স্থিতিস্থাপক না হয়, আর, একটির স্থির অবস্থায় আর একটি যদি তাহাকে চারি-মাত্রা বেগে আঘাত করে তবে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারী গোলাটির চারিমাত্রা বেগ ঘুচিয়া গিয়া দুইটি গোলাই দুই মাত্রা বেগে চলিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু চারিমাত্রা বেগ ক্রমে ক্রমে না কমিয়া এক মুহূর্ত্তেই কেমন করিয়া দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় ইহা কোন বিজ্ঞানেই বলিতে পারে না। এই তো গেল স্পেন্সরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান যাহা বলিতে পারে তাহা সে বলিতে পারে, যাহা সে বলিতে পারে না তাহা সে বলিতে পারে না ; কিন্তু যাহা সে বলিতে পারে না, তাহা বলিতে না পারিবার অপরাধে যাহা সে বলিতে পারে তাহা কাঁচিয়া যায় না। বিজ্ঞান এটা যদিও বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া আঘাতকারী গোলার চারিমাত্রা বেগ এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় অথবা কেমন করিয়া স্থির গোলাটিতে এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা বেগ সঞ্চারিত হয়, তথাপি বিজ্ঞানের এটা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে, গোলাদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থায় তাহাদের গতি ঐরূপ হইতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাটি বিজ্ঞান বলিতে পারে না বলিয়া বিজ্ঞানের শেষোক্ত স্থির সিদ্ধান্তটিও কি কিছুই নহে? অতএব, এ কথা যদি সত্যও হয় যে, চৈতন্য নিজে গতি-শূন্য হইয়া কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে—ইহা আমরাও বলিতে পারি না—বিজ্ঞানও বলিতে পারে না, তথাপি, চৈতন্য বাস্তবিকই যে ঐরূপ করে—ইহা স্বীকার করিতে আমাদেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, বিজ্ঞানেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। সূর্য্য লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কেমন করিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে—বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান বলে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে ; তেমনি চৈতন্য গতিহীন হইয়াও কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তন করে—তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথচ এটি আমরা ধ্রুব রূপে উপলব্ধি করি যে, চৈতন্য বাস্তবিকই তাহা করে। কেন না, যিনিই যখন আপনার হস্তপদ চালনা করেন, তিনিই তখন অন্তঃকরণে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করেন যে, আমিই আমার হস্তপদ চালনা করিতেছি। আমি যখন এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি তখন স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়াও যদি আমাকে বলেন যে, তোমার লেখনীটিকে তুমি চালাইতেছ না—আর কেহ চালাইতেছে,

তবে তাঁহার কথা আমি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিব না। আমার আপনার কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি; অন্যের কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি অনুমান-বলে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জড়বস্তুর আপনার গতির উপর তাহার আপনার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, তখন কাজেই ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব-কার্য্য দেখিবামাত্রই আমরা তাহাতে চৈতন্যেরই হস্ত উপলব্ধি করি। চৈতন্য কোন রূপ গতি দ্বারা নহে—শুদ্ধ কেবল ইচ্ছা দ্বারা—হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে। প্রভাত বাবুর এই যে, একটি যুক্তি যে, চৈতন্য কেমন করিয়া হস্তপদাদি চালনা করে তাহা যখন আমরা বলিতে পারি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চৈতন্য হস্তপদাদি চালনা করে না, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। কালিদাসকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কেমন করিয়া শকুন্তলার ন্যায় এমন একটা নিরুপম কাব্য-মাধুরী উদ্ভাবন করিলে? কালিদাস হয় তো তাহা বলিতে পারিবেন না; তাহা হইলেই কি প্রমাণ হইল যে, তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, তখন তিনি শকুন্তলার রচয়িতা নহেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কেমন করিয়া তুমি লেখ? আমি বলিব "লেখনী চালনা দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি লেখনী চালনা কর? অঙ্গুলি চালনা-দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি অঙ্গুলি চালনা কর? স্নায়ু বলের উত্তেজনা-দ্বারা। কেমন করিয়া স্নায়ুবলের উত্তেজনা কর? ইচ্ছা দ্বারা। কেমন করিয়া ইচ্ছা কর? এই স্থানটিতে "কেমন করিয়া" এ কথাটি জিজ্ঞাসা করা নির্ব্বোধের কার্য্য; কেন না, কেমন করিয়া ইচ্ছা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা পর'কে বুঝাইবার কথা নহে, আপনি বুঝিবারই কথা। শ্রীদ্বি]

পরন্তু উহাঁরা যদি এই কথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলেন তবে তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আর যদি বিজ্ঞান-মূলক বলেন তবে আমরা সেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

এখন মনে কর যে, চৈতন্য জড়াতীত ব্যক্তি নহে, কিন্তু জড় শক্তি বিকাশের ফল মাত্র। এই অভ্যুপগম অনুসারে বিচার করিলে জানা যাইবে যে চিমটি কাটিলে যে প্রথম গতি উৎপন্ন হয় তাহা মস্তিষ্কে যাইয়া বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তথায় এমত ভাবে ক্রিয়া করে যাহাতে সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইয়া চৈতন্য উৎপন্ন হয় অথবা চৈতন্য বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ বেদনা জন্মিয়া থাকে।

[আমরা তো জানি—বিজ্ঞান শুধু বলে যে, গতি হইতে (সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়) গতিই কেবল উৎপন্ন হয় (যেমন, সামান্য গতি হইতে সামান্য গতিও উৎপন্ন হইতে পারে, আর, বৈদ্যুতিক, ঔত্তাপিক, প্রভৃতি আণবিক (molicular) গতিও উৎপন্ন হইতে পারে) এ ভিন্ন কোন্ বিজ্ঞানে এরূপ কথা বলে জানি না যে, গতি হইতে গতির ফলভোক্তা, বা গতির নিয়ামক, বা গতির উপলব্ধি-কর্ত্তা, উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-বেত্তা পণ্ডিতেরা যদি গতি-সম্বন্ধীয় অমন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সত্য সত্যই আবিষ্কার করিয়া থাকেন—তবে এত দিনে তাহা গতি বিজ্ঞানে (Dynamics) স্থান পাইত—তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। কিন্তু কই? কোথাও তো তাহা দেখিতে পাই না। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের ক-অক্ষরও

জানেন না—তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অমূলক কথা শোভা পায়, প্রভাত বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের মুখে তাহা কোন-ক্রমেই শোভা পায় না। শ্রীদ্বি]

অতএব চৈতন্য এবং বেদনা বোধ যখন সঞ্চিত জড় শক্তির বিকাশ মাত্র, তখন তাহাতে যে একটী দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করিবে ইহা সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান বহির্ভূত নহে।

[পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, একটা ধাবমান গোলাতে তো যথেষ্ট জড়-শক্তির বিকাশ আছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তো বিজ্ঞান বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া তাহা একটা স্থির গোলাতে গতির সঞ্চার করে। অতএব কেমন করিয়া গতি সঞ্চারিত হয়—ইহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না—আমরাও বলিতে পারি না; কিন্তু বিজ্ঞানেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশীল বস্তু হইতে স্থির বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হয়, আমাদেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশূন্য চৈতন্য কর্তৃক হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা যদি বলিতাম যে গতিশূন্য চৈতন্য হইতে গতির সৃষ্টি হয়; তাহা হইলে অবশ্য প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, ও কথাটি নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেননা বিজ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত জড়জগতের মোট গতির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবে না। আমরা কেবল বলিতেছি এই যে, চৈতন্য শুদ্ধ কেবল গতির পরিবর্ত্তন কর্ত্তা—গতির নিয়ামক। আমরা যদি বলিতাম যে, গতিশূন্য চৈতন্য বহির্জগতে গতি প্রদান করে তাহা হইলেই প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, চৈতন্যের নিজেরই যখন গতি নাই তখন সে কিরূপে গতি প্রদান করিবে? যাহার ধন নাই সে কিরূপে ধন-দান করিবে? কিন্তু আমরা আদবেই তাহা বলি না; আমরা বলি এই যে, সমস্ত জড় জগতের মোট গতি যাহা আছে—তাহার ইয়ত্তা (Quantity) চিরকালই সমান; কোন-কালেই তাহার ন্যূনাধিক হয়ও না হইতে পারিবেও না। ইহা সত্ত্বেও গতির পরিবর্ত্তন দুইরূপে সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যথা;—(১) এক জড়বস্তুর গতি অন্য জড়বস্তুর গতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; (২) চৈতন্য দ্বারা জড়বস্তু বিশেষের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। গতির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে—গতির নূতন-সৃষ্টিই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। চৈতন্য নিজে বর্ণহীন হইয়াও যদি শ্বেতাদি বর্ণ দর্শন করিতে পারিল তবে সে নিজে গতিহীন হইয়াও হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তন করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রীদ্বি]

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চৈতন্য স্থির পদার্থ নহে। তাহা কখন কখন বিদ্যমান থাকে ও কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এবং কিছু কাল বিদ্যমান থাকিলে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে আর বিদ্যমান থাকিতে পারে না; তখনই নিদ্রা আবশ্যক হয়। সেই নিদ্রা নিবন্ধন বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হইলে চৈতন্যের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে।

[নিদ্রাবস্থাতেও যে সাক্ষী চৈতন্য অন্তর্হিত হ'ন না, তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রার সময়ে এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থা জ্ঞানে অনুভূত হয় তাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাকালে যদি আমার জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইত, তবে জাগিয়া উঠিবার সময় আমি নিছক অজ্ঞানের গর্ত্ত হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই-

তাম,—সুতরাং তাহা হইলে আবার আমাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতে হইত। শ্রীদ্বি]

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি চৈতন্য জড় শক্তিরই বিকাশ হয়, তবে তাহা কিরূপে আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বাস্তবিক আলোক আদির উত্তেজনাই চৈতন্য বিকাশের কারণ। প্রাণিগণ সর্ব্বদাই আলোক তাপ আদিতে পরিবেষ্টিত। সেই পরিবেষ্টক আলোক আদি নিয়তই প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়া নিবন্ধন মস্তিষ্কের কার্য্য হইতে থাকে আর তথাকার সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তাহা অবশেষে এরূপ লাঘব হইয়া পড়ে যে আলোক আদির সামান্য উত্তেজনায় চেতনা রক্ষা করিতে পারে না। এই হেতুই শীত কালের দুর্ব্বল তাপে মর্ম্মট প্রভৃতি শীতাসহ জন্তুগণকে জাগরিত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমুচিত নিদ্রা হইয়া শক্তির পুনঃ সঞ্চয়ের সহিত মস্তিষ্ক সতেজ হইয়া উঠিলে উক্ত সামান্য উত্তেজনেই আবার চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে। এই হেতুই সুস্থ ব্যক্তিগণ দিবালোক প্রকাশিত হইলে আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

[বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, জড় শক্তির বিকাশ দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; যেমন, সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ হয় কোথায়—ফল ফলে কোথায়? না পৃথিবীর বাৎসরিক গতিতে; জড়-শক্তি যদিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা;—যান্ত্রিক রাসায়নিক এবং জৈবনিক; তথাপি, সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া—শুদ্ধ যদি কেবল জড়-বস্তুর প্রতিই লক্ষ নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যান্ত্রিক (Mechanical) শক্তিই কেবল জড় বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি; কেননা, যান্ত্রিক শক্তি-দ্বারাই জড়বস্তু-সকল পরস্পরের গতি-পরিবর্ত্তন করে; আর এই যে গতি-পরিবর্ত্তন—ইহা শুদ্ধ কেবল জড়-বস্তুরই গতি-পরিবর্ত্তন—চেতনের নহে। কিন্তু রাসায়নিক অথবা জৈবনিক শক্তি দ্বারা জড়-বস্তুর গুণ-পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হয়—সমস্তই ইন্দ্রিয়-মূলক; সুতরাং তাহা জড়বস্তুর নিজের গতি-পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু জীব চৈতন্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন। উদজন এবং অম্লজন বাষ্প যথা-পরিমাণে মিশ্রিত হইলে আমাদের নেত্র-সমক্ষেই তাহা জলরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু উক্ত বস্তু দ্বয়ের নিজের অভ্যন্তরে শুদ্ধ কেবল যান্ত্রিক শক্তিই কার্য্য করে, এবং তাহার ফল শুদ্ধ কেবল আণবিক গতি-পরিবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয়। এ যাহা বলিলাম—মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে—সাক্ষী-চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া জড়-বস্তুকে স্বতন্ত্ররূপে ভাবা—মনুষ্যের শুধু নয়—দেবতারও সাধ্যাতীত। যখন আমি আলোক ভাবি, তখন আমি চক্ষে দেখা আলোক ভাবি; যাহা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই ও দেখিতে পারে না—এরূপ আলোক আলোকই নহে। শূন্য আকাশকে আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখি না বটে—কিন্তু তথাপি তাহাকে আমরা মনশ্চক্ষে দেখি। গতি কাহাকে বলে? না সেই মনশ্চক্ষে দেখা আকাশের স্থান-পরিবর্ত্তন। কিন্তু মোটামুটি এরূপ বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না যে, যান্ত্রিক শক্তি-প্রবর্ত্তিত গতিই কেবল জড়-বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি তা ভিন্ন জড়-বস্তুর আর যত প্রকার গুণ আছে সমস্তই ঐন্দ্রিয়ক গুণ—সুতরাং চেতন-সা-

পেক্ষ। অতএব শুদ্ধ কেবল জড়-শক্তি দ্বারা—যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা—গতি ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না; আলোকাদির উত্তেজনা চেতন-সাপেক্ষ। অগ্রে প্রাণী এবং তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিলে তবে তো আলোক দ্বারা তাহার দৃষ্টি-শক্তি উত্তেজিত হইবে! অতএব আলোকাদি-জনিত উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণীর বিদ্যমানতা আবশ্যক; কেন না, অগ্রে প্রাণী না থাকিলে আলোকাদি দ্বারা কাহার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবে? তবেই হইতেছে যে, প্রাণী আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে—প্রত্যুত তাহা উক্ত উত্তেজনার আধার-স্বরূপ। যদি বল যে, আলোকাদির উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণী ছিল বটে কিন্তু তখন সে জড় পদার্থ মাত্র ছিল, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে না—সে বস্তু আলোকাদি-দ্বারা উত্তেজিত হইতেও পারে না; এক কথায়, জড়বস্তু আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে না; কেবল যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে সেই বস্তুই (এক কথায় সচেতন বস্তুই) আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু "উত্তেজিত" এই শব্দের অর্থ ভুল বুঝিলে চলিবে না; দপ্ করিয়া যখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, অগ্নি উত্তেজিত হইল; উত্তেজনা একটি মাত্র কথা, কিন্তু ইহাতে দুইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে; এক অর্থ—আণবিক (Molicular) গতির বেগাধিক্য—যাহা অগ্নির অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে; আর এক অর্থ—গতি নহে কিন্তু দীপ্তি-বোধ—যাহা সচেতন জীবের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এখানে আলোকাদির উত্তেজনা বলিতে পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তেজনা (কিনা গতি-বেগ মাত্র) বুঝিলে চলিবে না। কেন না, উত্তাপ জড়-বস্তুতে তীব্রবেগসম্পন্ন গতি উৎপাদন করিতে পারে ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; আমাদের মন্তব্য কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, উত্তাপ সচেতন প্রাণী ভিন্ন কোন প্রকার অচেতন পদার্থে তাপবোধ উৎপাদন করিতে পারে না। উত্তাপের অনুভব শক্তি যাহার আছে এমন যে সচেতন জীব, উত্তাপ কেবল তাহারই স্পর্শেন্দ্রিয়কে তাপানুভব দ্বারা উত্তেজিত করিতে পারে। অতএব অগ্রে অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন সচেতন জীব—তাহার পরে আলোকাদির উত্তেজনা; এ নহে যে, অগ্রে আলোকাদির উত্তেজনা—তাহার পরে সচেতন জীব। তবেই হইতেছে যে, সচেতন জীব আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে কিন্তু আধার-স্বরূপ। শ্রীদ্বি]

অতএব বিজ্ঞান মতে মস্তিষ্কই চিন্তার যন্ত্র। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিশেষ হইতেই মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর মানসিক কার্য্য সমঞ্জস ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে মস্তিষ্কের এমত অবস্থা থাকারই নাম চৈতন্য। অতএব মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। যেখানে মস্তিষ্ক আছে সেইখানেই চৈতন্য জন্মিতে পারে। যেখানে মস্কিষ্ক নাই তথায় চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্কের অভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এমত বলা "সৃষ্টিছাড়া কার্য্য" এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত।

[প্রমেয় বিষয় দুইরূপ—(১) পরীক্ষাসিদ্ধ এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ। পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য ঘরে বসিয়াই প্রমাণ করা যাইতে

পারে। প্রভাত বাবুর এই যে একটি কথা যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের চৈতন্য মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা বাস্তবিকই যদি পরীক্ষাসিদ্ধ হয় তবে তাহা শিরোধার্য্য করিতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে; আমরা কেবল এইটুকু মাত্র জানি যে, পৃথিবীস্থ জীবগণেরই মস্তিষ্ক যন্ত্র আবশ্যক—তাহাও আবার সকল জীবের নহে; আমীবিয়া নামক জীব শুদ্ধ কেবল একটা তল্‌তলে পিণ্ড মাত্র—তাহার না আছে মস্তিষ্ক—না আছে কিছু। প্রভাত বাবু যদি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, জীবমাত্রই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট, তবে আমরা শুদ্ধ কেবল এই বলিব যে, তাঁহার পরীক্ষা শক্তির পক্ষ প্রলয় বিস্তীর্ণ; আমাদের পরীক্ষা শক্তি পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র কাজেই এ'র অত বড় একটা পালখ উঠিলে—এ তাহার ভারে চাপা পড়িয়া তদ্দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিবে। বহুপূর্ব্বে এক কালে যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জলে জলময়-ছিল তখন পৃথিবীতে মেরুদণ্ডধারী প্রাণীদিগের মধ্যে শুদ্ধ কেবল মৎস্য কুম্ভীরাদি শীতলশোণিত জীবদিগেরই একাধিপত্য ছিল—পৃথিবীতে তখন এইরূপ ছিল বলিয়া কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, তখন সমস্ত জগতেরই মেরুদণ্ডধারী জীব শীতল শোণিত ছিল। তেমনি অদ্যকার এই পৃথিবীতে উচ্চ শ্রেণীর জীব মাত্রেই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত হইলেও তাহাতেই কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, সমস্ত জগতের সমস্ত উচ্চশ্রেণীর জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; কেননা, সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এমন হইলেও হইতে পারে যে, সমস্ত জগতের সমস্ত জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; তবে কি—না তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ; সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে আমরা সে বিষয়ে হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না। অতএব প্রভাত বাবু যে কথাটি বলিতেছেন তাহা নিতান্তই পরীক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যে কথাটি বলিতেছি তাহা স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং পরীক্ষা-নিরপেক্ষ; তাহা এই;—জগতের সকল বস্তুই পরের আকর্ষণে বিধৃত, সুতরাং পরাধীন; সুতরাং সমস্ত জগৎই পরাধীন বস্তুর সমষ্টি; প্রত্যেক সেনাই যদি পরাধীন হয়, তবে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী কাজে কাজেই পরাধীন। অতএব, জগতের সমস্ত বস্তুই যখন পরাধীন, তখন অবশ্য সমস্ত জগৎই পরাধীন। অতএব সমস্ত জগৎ কাহারো না কাহারো আশ্রয়াধীন; সমস্ত জগৎ যাঁহার আশ্রয়াধীন, তিনি নিজে পরাধীন হইতে পারেন না; কেননা এক পরাধীন অন্য পরাধীনকে আশ্রয় দান করিতে পারে না, ভীরু ভয়ার্ত্তকে অভয়-দান করিতে পারে না, অন্ধ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ, সুতরাং তিনি মস্তিষ্কের অথবা বাহিরের অন্য কোন সামগ্রীর সাহায্য-নিরপেক্ষ। পরিপূর্ণ দ্বিগুণ সত্তাই—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সচেতন সত্তাই—যে, সমস্ত অপূর্ণ সত্তার মূলাধার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। খণ্ড আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত এ সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য অশেষবিধ খণ্ড আকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই,—

আমরা ঘরে বসিয়াই অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত। পুনশ্চ, এক-স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে সরল পথই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ, এই সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য বক্র পথ মাপিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, উহা স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ, অপূর্ণ পরাধীন জগৎ যে, পূর্ণ স্বাধীন পুরুষের আশ্রয় সাপেক্ষ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ—তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। অতএব, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ তিনি মস্তিষ্ক যন্ত্রের অধীন নহেন। শ্রীদ্বি]

এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়, না আরোপ না করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়? সুতরাং ডাক্তার ড্রিষ্‌ডেল্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহাতে চৈতন্য আরোপ করিতে চাহেন না তাহাই বিজ্ঞান অনুগত? না, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞান-সঙ্গত? যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক-যুক্ত ব্যক্তিই বলেন তবে তাঁহার ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর যদি তিনি ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক-হীন বলিয়া তাহাতে চেতনা আরোপ করিতে চাহেন তবে তিনি এরূপ ব্যক্তির আদর্শ কোথায় দর্শন করিয়াছেন? যাহার কোন আদর্শ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কল্পনা যে বিজ্ঞান-সঙ্গত ইহা তিনি কোন্ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন করিবেন?

[নিউটন কি কোথাও দেখিয়াছেন যে, কোন একটি জড়পিণ্ড অবাধিত গতিতে চলিয়া অনন্তকাল সরল-রেখা পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে? তিনি তাহা কস্মিন্ কালেও দেখেন নাই—আর-কেহও তাহা দেখে নাই দেখিবে না। অথচ তিনি এই সত্যটি কৃতবিদ্য-সমাজে প্রচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই যে, কোন একটি চলমান বস্তু কোন প্রকার বল দ্বারা বাধিত না হইলে তাহা অনন্তকাল সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটনের এ কথাটি এরূপ নহে যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে; এক কথায়—তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যথা;—পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাই—কারণ ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না—এ তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং বিনা কারণে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অতএব চলমান বস্তু বল দ্বারা বাধিত না হইলে একই সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটন্ কোন জড়পিণ্ডকেই অনন্ত কাল সরল রেখা পথে চলিতে দেখেন নাই ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া গেল? আমরা জগতের কুত্রাপি পরিপূর্ণ সত্য দেখি নাই দেখিবও না, ইহা তেমনিই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি এই সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি একেবারেই কিছুই না যে, অপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল-প্রমাণেরই মূলাধার; যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন, তাঁহাদের উপর শ্লেষ দিয়া আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ দর্শনকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমনি মহাপণ্ডিত যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে সেই জ্ঞানকে (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে) তাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন; যে অগ্নি

কাষ্ঠকে দহন করে সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন।" ইহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত ;—মনে কর চন্দ্র-লোক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে, চন্দ্র-লোকে সমস্ত কাকই শ্বেতবর্ণ ; ইহার আমি এই উত্তর দিব যে, সাদা কাক আমিও দেখি নাই পৃথিবীস্থ অন্য কোন মনুষ্যও দেখে নাই, কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ যে, চন্দ্র-লোকের সকল কাকই শ্বেতবর্ণ তখন তোমার কথায় অবিশ্বাস করিবার আমি কোন কারণ দেখি না ; তুমি যাহা বলিতেছ তাহা হইলেও হইতে পারে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বলে যে, চন্দ্র-লোকে একটা গোলাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গড়াইয়া দিলে কিয়ৎদূর পশ্চিমাভিমুখে গিয়াই তাহা বিনা কারণে উত্তরাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি বলিব যে, কখনই না—তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না ; কারণ-ব্যতিরেকে কোন পরিবর্ত্তনই যখন ঘটিতে পারে না, তখন কারণ ব্যতিরেকে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিবে? কাক সাদা হয় এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই, আর, বিনা কারণে পরিবর্ত্তন ঘটে এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই ; তবে, ওটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "হইলেও হইতে পারে" আর এটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "কখনই না!" এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, যাহা কেবল-মাত্র পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে—দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে তাহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার কুত্রাপি এবং কস্মিন্ কালেও অন্যথা সম্ভবে না ; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ হওয়া দূরে থাকুক—তাহা সকল পরীক্ষারই ভিত্তিভূমি ; কেননা, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাইই-চাই এই তত্ত্বটি পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই পরীক্ষার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ কারণ অন্বেষণ করিতে তৎপর হই। এ যেমন, তেমনি অপূর্ণ সত্য মাত্রই পূর্ণ সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ—ইহা একটি পরীক্ষা-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ভক্ত সাধকেরা নিঃশংসয়ে এবং অকুতোভয়ে ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কি বিজ্ঞান—কি তত্ত্বজ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আশ্রয়-ব্যতিরেকে কেহই এক পদও চলিতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তিনি তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমর্থন করিতে যান, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ তাহা তাঁহার নিজেরই সম্পত্তি। তিনি আপন সম্পত্তিকে যাহা ইচ্ছা তাহাই মনে করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।

[জগৎশুদ্ধ জীবের মস্তিষ্ক যদি প্রভাত বাবুর সম্পত্তি হইতে পারিল তবে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যাহা বাস্তবিকই জ্ঞানবান জীব মাত্রেরই (কাজেই প্রভাত বাবুরও) পৈতৃক সম্পত্তি—তাহার অংশ আমাতেও যৎকিঞ্চিৎ বর্ত্তিবে—ইহা তো হইবারই কথা। শ্রী দ্বি]

এখন দ্বিজেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ডাং ড্রিস্‌ডেলের মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই না বলেন এবং তিনি যে কিরূপ পদার্থ তাহাও বলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে

ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, উঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুগত নহে। তাহা কেবল বিশ্বাসেই অনুগত। বিশ্বাস বাস্তবিক চক্ষুহীন অন্ধ। সে বিজ্ঞানের কথা গ্রহণ করিতে চাহে না, এবং গ্রহণ করিতে সক্ষমও নহে। এই অন্ধ বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্র বাবুতেও বলবান্ রহিয়াছে। তাহাতেই তিনি বিজ্ঞানের সমস্ত উপদেশ ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের অনুকূলে অবৈজ্ঞানিক কথারও যোজনা করিতেছেন। এবং অন্য কেহ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতি কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না।

[স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বতন্ত্র, আর অন্ধ বিশ্বাস স্বতন্ত্র। "অমুক বড়লোক (যেমন প্রক্টর বা ডিস্‌ডেল) এই কথা বলিয়াছেন অতএব ইহা বেদবাক্য" ইহারই নাম অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে—খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত—অপূর্ণ সত্য মাত্রই পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন—এরূপ ধ্রুব তত্ত্বসকল অন্ধ বিশ্বাস নহে কিন্তু জাগ্রত জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করিলে যদি লোককে অবৈজ্ঞানিক হইতে হইত, তাহা হইলে নিউটন্‌ও অবৈজ্ঞানিক; যেহেতু, এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে। স্বতঃসিদ্ধ সত্য-সকল সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তিমূল। কাজেই, যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি বিমুখ হইয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহারা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালেন; তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্মের অভ্যন্তরে তলাইতে পারেন নাই; এ সম্বন্ধে বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্, যথা,—A little philosophy inclineth man's mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. অল্প জ্ঞান মনুষ্যের মনকে নাস্তিক্যের দিকে টানে; গভীর জ্ঞান লোকের মনকে ঈশ্বর-ভক্তির দিকে টানে। শ্রী দ্বি]

আমরা সম্প্রতি এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। কারণ একত্রে আর অধিক বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে না। আমরা এই প্রস্তাবে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহারই যে, কত ডাল পালা বহির্গত হয় তাহা বলা যাইতে পারে না।

কাণ্টের দর্শন

এবং

বেদান্ত দর্শন।

সত্য নিরূপণ করাই জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মনোগত সত্য এবং (২) বস্তুগত সত্য। যাহার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার নিকটে তাহাই সত্য—এইরূপ যত কিছু সত্য, অর্থাৎ যাহার সত্যতা ব্যক্তিবিশেষের মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাই মনোগত (subjective) সত্য; আর, যে সত্য মনের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না স্থতরাং সত্যবাদিসম্মত, তাহাই বস্তুগত (objective) সত্য। বস্তুগত সত্যের আর এক নাম বাস্তবিক সত্য; মনোগত সত্যের আর এক নাম প্রাতিভাসিক সত্য; প্রাতিভাসিক সত্য—অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রতিভাসিত হয়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস।

একজন অনভিজ্ঞ কৃষকের নিকটে সকলই বাস্তবিক সত্য। তাহার নিকটে চন্দ্র একখানি থালা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপে না; পৃথিবী পর্ব্বতের ন্যায় অচল;

সূর্য্য সাগর-গর্ত্ত হইতে গাত্রোত্থান করে এবং সাগর-গর্ভে নিলীন হয়। সমস্তই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি ধ্রুব সত্য। দৈবাৎ যদি কখন ভূমি-কম্প হইল—তখন পৃথিবীর স্থায়িত্বের উপরে তাহার বিশ্বাস কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত হয়, তাহার পরেই তাহার মনোমধ্যে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, পৃথিবী বাসুকীর মাথার উপরে ভর করিয়া আছে—বাসুকী মাথা নাড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; এই কথাটি শুনিবা-মাত্রই কৃষকের সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। "পৃথিবী অটল" ইহা যেমন—"তাহা বাসুকীর মস্তকের উপর ভর করিয়া আছে" ইহাও তেমনি—দুইই তাহার নিকটে বাস্তবিক সত্য—ধ্রুব সত্য। পৃথিবীকে সে অষ্ট প্রহর দর্শন করিতেছে স্পর্শ করিতেছে, বাসুকীকে কেহই দেখে নাই—স্পর্শ করে নাই, কৃষকের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ সত্যও যেমন বাস্তবিক—আনুমানিক সত্যও তেমনি বাস্তবিক;—চক্ষে দেখা সত্যও যেমন—কর্ণে শুনা সত্যও তেমনি—উভয়ই ধ্রুব সত্য। তাড়কা রাক্ষসীর মুখব্যাদানের ন্যায় তাহার বিশ্বাসের পরিধি আকাশ-পাতাল-ব্যাপী, তাহার অভ্যন্তরে সংশয়ের একবিন্দুও অবকাশ নাই। তুমি আজিকের কালের এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—কৃষকের মনের এইরূপ সংশয়-শূন্য নির্ভীক অবস্থা দেখিয়া তুমি মনে মনে হাস্য করিতেছ, কিন্তু হাস্যে ক্ষান্ত হও। কৃষকের নিকট সকলই বাস্তবিক সত্য—এ যেন খুবই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই বাস্তবিক সত্য নহে অথচ তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহাই বাস্তবিক সত্য,—ইহা কি উহা অপেক্ষা কম হাস্যাস্পদ? তুমিও বাস্তবিক সত্য জান না, কৃষকও বাস্তবিক সত্য জানে না; তুমিও বলিতেছ যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই বাস্তবিক সত্য, কৃষকও তাহাই বলিতেছে; কিন্তু কৃষকের মন সংশয়শূন্য প্রশান্ত—তোমার মন সংশয়ের বিষ-দংশনে অস্থির; এ বিষয়ে তোমা-অপেক্ষা কৃষক পরম ভাগ্যবান্—তাহাতে আর ভুল নাই। কৃষক সত্য না জানিয়াও যেমন সত্যে নিঃসংশয়, তুমি সত্য জানিয়া যদি সত্যে তেমনি নিঃসংশয় হইতে পার, তবেই বলিব যে, তুমি কৃষক অপেক্ষা জ্ঞানে বড়, কেননা তুমি বাস্তবিক সত্য জান—কৃষক তাহা জানে না; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ তুমিও যা, কৃষকও তা সমানই; বরং কৃষক তোমা অপেক্ষা ভাল, কেননা তাহার মনে শান্তি বিরাজ করিতেছে—তোমার মনে শান্তি নাই। এই স্থলে কৃতবিদ্য ব্যক্তি উষ্ণ হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন সন্দেহ নাই যে, "বিজ্ঞান বলিয়া যে, একটা সামগ্রী আছে, তাহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গেলে? তোমার মস্তকের উপরে মধ্যাহ্ন দিবাকর দেদীপ্যমান—তাহাও কি তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক সত্যের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞান নহে তো আর কে?" ইহার উত্তরে আমরা বলি,—থামো! তোমাদের পরম গুরু এবং নেতা কম্‌ৎ বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিক সত্য ভিন্ন বাস্তবিক সত্যে হস্ত প্রসারণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। কম্‌ৎ বলেন "বিজ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যকেই বাস্তবিক সত্য বলিয়া মানিয়া লও—তাহাতেই জনসমাজের সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত

হইতে পারে। তাহার সাক্ষী—সূর্য্যের আকর্ষণ; সূর্য্যকে কেহ পৃথিবী আকর্ষণ করিতে দেখেও নাই দেখিবেও না; কে তবে বলিল যে, সূর্য্য পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে? ভেক যেমন জিহ্বা প্রসারণ করিয়া কীট আকর্ষণ করে, সূর্য্য কি সেই-রূপ কোন সূক্ষ্ম বস্তু প্রসারণ করিয়া পৃ-থিবী আকর্ষণ করে? না দৈবজ্ঞ যেমন মন্ত্র দ্বারা বাটি চালনা করে, সূর্য্য সেই-রূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেও শূ-ন্যের মধ্য-দিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? বিজ্ঞান নিরুত্তর! সুতরাং এখানে আক-র্ষণ কথাটাই অপ্রামাণ্য; অতএব আকর্ষণ বিকর্ষণ এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া "পৃ-থিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এইটুকু জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাক – বেশী বাড়াবাড়ি করিও না!" এই তো দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে বাস্তবিক সত্য বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত—ব্যবহারিক সত্যই বি-জ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কম্-টির এ কথার বিরুদ্ধে আমরা বলি যে, পৃথিবী যে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি কোন কারণ আছে—না কারণ নাই? কিয়ৎ মাস ধরিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে ক্রমশই দূরে প্রস্থান করে, তাহার পরে সেরূপ না করিয়া ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করে কেন? অবশ্যই তা-হার কোন না কোন কারণ আছে। অত-এব পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ইহা যেমন সত্য—তাহার একটা না একটা কা-রণ আছে ইহা তেমনিই সত্য; পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কার্য্য এবং তাহার কারণ—দুয়ে মিলিয়া তবে একটা সমগ্র সত্য দাঁড়ায়। কম্‌টি ঐ সমগ্র সত্যটির প্রতি হাত বাড়া-ইতে মানা করেন; তিনি পৃথিবীর প্রদ-ক্ষিণ কার্য্য মাত্রটিতেই—আধখানা স-ত্যেই—সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন। এটা তিনি দেখিতেছেন না যে, বিজ্ঞানকে অৰ্দ্ধ সত্যে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, আর, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আধ-পেটা অন্নে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, দুইই সমান। ধরিতে গেলে—বিজ্ঞান অৰ্দ্ধ সত্যও বোঝে না—সিকি সত্যও বোঝে না—বাস্তবিক সত্যই তাহার একমাত্র অন্বেষণের বিষয়; তবে কি না—অপার্য্যমানে সে অর্দ্ধ সত্যেই আপাততঃ সন্তোষ অবলম্বন করে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে, নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। কিন্তু তাহা বলিয়া অৰ্দ্ধ সত্য কি বাস্তবিক সত্য? সত্য বটে যে, আমার নিকটে চন্দ্রের এক পিট মাত্র প্র-কাশ পায়—কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই কি চন্দ্রের সেই দৃশ্যমান পৃষ্ঠই তাহার সর্ব্বস্ব? সমগ্র সত্যই বাস্তবিক সত্য। অৰ্দ্ধ সত্যে বিজ্ঞানের এবং সংসারের কার্য্য খুবই চলিতে পারে; এমন কি প্রতি বৎ-সর সূর্য্য স্বয়ং উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাতায়াত করে—ইহার উপরে ভর করিয়াই কৃষকের কৃষি-কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে; অথচ বিজ্ঞান শেষোক্ত সত্যকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কম্‌টি যদি বলিতে পা-রিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করি-তেছে—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কেন করে কি বৃত্তান্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না, কৃষক তবে এ কথা না বলিতে পারিবে কেন যে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হই-তেছে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—কেন তাহা হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না? পণ্ডিতের জ্যোতির্বিদ্যাই শুধু যে, বিজ্ঞান, কৃষকের জ্যোতির্বিদ্যা যে, আদ-বেই বিজ্ঞান নহে, এরূপ কথা নিতান্তই

অত্যুক্তি। এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের কৃষি-বিদ্যা অতীব স্থূল রকমের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বেত্তার কৃষি-বিজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম রকমের বিজ্ঞান, কিন্তু দুইই বিজ্ঞান তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কেননা প্রণালী-পদ্ধতি দুয়েরই সমান। পণ্ডিতেরাও যে প্রণালীতে উদ্ভিদ্‌ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন—কৃষকেরাও সেই প্রণালীতে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে; সে প্রণালী কি? না ভূয়োদর্শন এবং বহুদর্শন। কমৃটির অর্দ্ধ সত্য নয় ষোলো আনা বৈজ্ঞানিক, কৃষকের সিকি সত্য নয় আট আনা বৈজ্ঞানিক—কিন্তু তাহাতে কি? অর্দ্ধ হউক—সিকি হউক্—বৈজ্ঞানিক তো বটে! উপকারিতা দুয়েরই সমান—বরং কৃষকের কৃষি-বিদ্যা জন-সমাজের বেশী উপকারী; মূল পদ্ধতিও দুয়েরই সমান—ভূয়োদর্শন এবং বহু-দর্শন। বিদ্যার তবে কিসে এত মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর এই যে, বিদ্যার মাহাত্ম্য তাহার পদ্ধতি-নিবন্ধনও নহে—উপকারিতা-নিবন্ধনও নহে; বাহিরের নিয়ম সকলকে মনের ভাবের ন্যায় অন্তরে পাওয়া—ইহাই বিজ্ঞানের চমৎকারিতা; আর, মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করা ইহাই শিল্প বিদ্যার চমৎকারিতা। যাহাই হউক্—কৃষকেরাও কতক পরিমাণে বাহিরের নিয়ম সকলকে মনোমধ্যে আয়ত্ত করে—এ জন্য কৃষকের কৃষি-বিদ্যাও মোটামুটি বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

উপরে দেখানো হইল যে, সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বাস্তবিক (যথা পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান), (২) প্রতিভাসিক (যথা পৃথিবী অটল); এখন বক্তব্য এই যে, প্রাতিভাসিক সত্য এবং বাস্তবিক সত্য উভয়ই মিশ্র এবং অমিশ্র (বা বিশুদ্ধ) এই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের ভিতরেও বাস্তবিক সত্য আছে, আর, "পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান" এই বাস্তবিক সত্যের মধ্যেও প্রাতিভাসিক সত্য আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন পৃথিবী প্রকাশমান, পশুদিগেরও সেইরূপ; কিন্তু "পৃথিবী সচল কি অচল" এ ভাবনার দায়ে কোন পশুরই একদিনের জন্যও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। পশুদিগের ইন্দ্রিয়ে রূপরসাদি প্রকাশ পায়—এই মাত্র; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিতে সত্য প্রকাশ পায় না। পশুরা ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে নিকটে অগ্রসর হয়, এইরূপ অনেক কার্য্য জ্ঞাতসারে করে বটে; কিন্তু কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া অবধারণও করে না এবং মনোমধ্যে যত্ন পূর্ব্বক পোষণও করে না। পশু-দিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে পৃথিব্যাদি যেরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু "পৃথিবী অটল" এ যে প্রাতিভাসিক সত্য, ইহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য রহিয়াছে; "পৃথিবী অটল" ইহা বলিবা মাত্রই প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ। অতএব, "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের মূলে, "পৃথিবী বস্তু-বিশেষ" এই বাস্তবিক সত্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পশুরা সত্যাসত্যের কোন ধারই ধারে না—মানসিক সংস্কারই তাহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু কি কৃষক, কি পণ্ডিত, সকল মনুষ্যই (অন্ততঃ কার্য্যের সুবিধার জন্য) সত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষকের এই যে একটি কথা যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ, এটি তো বাস্তবিক সত্য? তবেই হইতেছে যে, "পৃথিবী অচল" বলিতে যে অংশে বুঝায় যে, পৃ-

থিবী বস্তু-বিশেষ, সেই অংশে উহা বাস্তবিক সত্য, আর, যে অংশে বুঝায় যে, "পৃথিবী আমাদের চক্ষে অটল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে" সেই অংশে উহা প্রাতিভাসিক সত্য। কৃষকের অল্প দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী অচল; পণ্ডিতের বহু দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী ঘূর্ণমান; কিন্তু "পৃথিবী কেন ঘুরিতেছে" তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহা মহা পণ্ডিতেরাও তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদানে পরাভব মানেন; অগাধ সমুদ্রে কেহ বা হাঁটু-জল পর্য্যন্ত—কেহ বা কোমর-জল পর্য্যন্ত—অগ্রসর হ'ন, তাহার পরে কোথাও আর থই পা'ন না। পণ্ডিত ব্যক্তি মনশ্চক্ষে—কল্পনাতে—দেখিতেছেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে; অতএব, পৃথিবী-শুদ্ধ কেবল ঘুরিতেছে—আপনা আপনি ঘুরিতেছে, এটিও কল্পনার প্রাতিভাসিক সত্য; তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য এই যে, পৃথিবী কারণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে। অতএব, কি চাসার মোটামুটি সিদ্ধান্ত, কি পণ্ডিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত, উভয়েরই মূলে বাস্তবিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর উভয় সিদ্ধান্তই বাস্তবিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এই দুইরূপ সত্যের সম্মিশ্র। এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য যদিচ পূর্ণ-মাত্রায় বাস্তবিক নহে, তথাপি তাহাতেই লোক-সমাজের কার্য্য কোন-না-কোন প্রকারে চলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের এ যেমন—নৈতিক সত্যেরও তেমনি—কোনটিরই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি জন-সমাজের কার্য্য-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায় না; স্বার্থের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে—ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে—এক প্রকার মিশ্র নৈতিক সত্য লোক-সমাজের প্রবর্ত্তক।

এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া, তাহা ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া উক্ত হয়। ব্যাবহারিক সত্যের মধ্য হইতে তাহার প্রাতিভাসিক অংশটি টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অমিশ্র বাস্তবিক সত্য; ঐকান্তিক অমিশ্র বাস্তবিক সত্য বেদান্ত দর্শনে পারমার্থিক সত্য বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি আবার, ব্যবহারিক সত্যের মধ্য হইতে বাস্তবিক সত্য টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য—তাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা সত্য নামেরই অযোগ্য; এইরূপ অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য বেদান্ত-দর্শনে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই নামে অভিহিত হয়। মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং অবিদ্যা জীবের বন্ধন। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র বাস্তবিক সত্য, এক কথায়—পারমার্থিক সত্য এবং (২) মিশ্র বাস্তবিক সত্য—এক কথায় ব্যাবহারিক সত্য; তেমনি আবার, প্রাতিভাসিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস, (২) মিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ব্যাবহারিক সত্য। অতএব ব্যাবহারিক সত্যের একদিকে পারমার্থিক সত্য আর একদিকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—উহা দুয়ের সম্মিশ্র।

এখন, কথা হ'চ্চে এই যে, বাস্তবিক সত্য—দর্শন এবং বিজ্ঞান দুয়েরই অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু উপরে দেখা গেল যে, বাস্তবিক সত্য—আমিশ্র কিনা পারমার্থিক এবং মিশ্র কিনা ব্যাবহারিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহার মধ্যে পারমার্থিক

সত্য দর্শনের মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়, ব্যাবহারিক সত্য বিজ্ঞানের (বস্তু-বিজ্ঞানেরও বটে নীতি-বিজ্ঞানেরও বটে) মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়। ব্যাবহারিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বস্তু-ঘটিত এবং কর্ত্তব্য-ঘটিত, এক কথায় বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক। পারমার্থিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেবতা সম্বন্ধীয় এবং মনুষ্য-সম্বন্ধীয়; আধিদৈবিক কি? না ব্রহ্ম; আধ্যাত্মিক কি? না জীবের মুক্তি। ঐন্দ্রিয়ক প্রাতিভাসিক সত্যও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধিদৈবিক (অর্থাৎ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়) তাহা মায়া বলিয়া উক্ত হয়; মায়া কি? না প্রকৃতি (অর্থাৎ ঐশী-শক্তি); আর, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধ্যাত্মিক (অর্থাৎ মনুষ্য-সম্বন্ধীয়) তাহা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়; অবিদ্যা অর্থাৎ জীবের মোহ-বন্ধন। মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের বিপরীত পৃষ্ঠ; আর, অবিদ্যা বা মোহ-বন্ধন মুক্তির বিপরীত পৃষ্ঠ। অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগ সর্ব্ব সমেত এইরূপ;—

সত্য

বাস্তবিক প্রাতিভাসিক

পারমার্থিক ব্যাবহারিক ঐন্দ্রিয়ক

ব্রহ্ম মুক্তি বৈজ্ঞানিক নৈতিক মায়া অবিদ্যা

এতক্ষণ ধরিয়া এই যাহা ভূমিকা করা হইল, ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল—কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন এ দুয়ের প্রবেশ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া। কাহাকে বলে পারমার্থিক সত্য তাহা আমরা জানিলাম—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বাস্তবিক সত্যই পারমার্থিক সত্য। কাহাকে বলে ব্যাবহারিক সত্য তাহাও আমরা জানিলাম—যাহাতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এইরূপ মিশ্র সত্যই ব্যবহারিক সত্য, যেমন—নৈতিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাতিভাসিক সত্য কাহাকে বলে তাহাও আমরা জানিলাম—যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রকাশ পায় তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য। দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহাও আমরা জানিলাম—পারমার্থিক সত্য নিরূপণ করাই দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

কাণ্টের মতে পারমার্থিক সত্য তিনটি—(১) ঈশ্বর, (২) মুক্তি (Freedom), (৩) আত্মার অমরত্ব। কাণ্ট তাঁহার প্রথম গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের জ্ঞানের অতীত। সে গ্রন্থের নাম বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অবলম্বনীয়। এ গ্রন্থের নাম ব্যবহারিক জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কাণ্ট একবার এককথা না বলিয়া দুইবার দুই কথা বলিলেন কেন—এই প্রহেলিকাটির ভিতর তলাইতে হইলে তাঁহার মূলগত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টি অতীব সহজ; আর, সহজ বলিয়াই তাহা পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সহজ সত্য তো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়—তাহার জন্য আবার দর্শনের প্রয়োজন কি? দর্শনের কাজই এই যে, দর্শন আমাদিগকে জটিল সত্য বুঝাইয়া দিবে। ইহাঁদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রথম পঁইটা গুলি অতীব সহজ; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া

কেহ যদি এক লম্ফে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে যা'ন, তবে তিনি তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না;—ইতর ভাষায় যাহাকে বলে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি" তাঁহার আশার দশা সেইরূপ হয়। অতএব কাণ্টের দর্শন রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; অভিপ্রায়টি অতীব সরল এবং পরিষ্কার—তাহার মধ্যে কূট-কচালিয়া কিছুই নাই, তাহা এই;—বাস্তবিক সত্যই অন্বেষ্য বিষয়। মনে কর যেন বাস্তবিক সত্য আমি মুষ্টি মধ্যে পাইয়াছি,—তবে তাহা কি সত্য-সত্যই বাস্তবিক, না কেবল আমার নিকটেই বাস্তবিক বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্যের, এক কথায় পারমার্থিক সত্যের, প্রমাণাভাব; তাই বলি যে, পারমার্থিক সত্যের সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথার উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বাস্তবিক সত্য কতদূর প্রামাণিক তাহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যা'ক্। বিজ্ঞান তো বাস্তবিক সত্য অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছে—বিজ্ঞান তো দিন দিনই বাস্তবিক সত্যের পথে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে; বিজ্ঞান সত্যের যতখানি প্রদেশ জয় করিয়াছে, তাহা তো বিলক্ষণই সুনিশ্চিত—তাহা তো বাস্তবিকই সত্য। আর এক দিকে দেখা যায় যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মূলে এমনি কতক গুলি প্রবল সত্য আছে যে, সেগুলি যদি অবাস্তবিক হয় তবে মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই বৃথা পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। বাস্তবিক সত্যকে যে, কোন্ পথে অন্বেষণ করিতে হইবে—সমগ্র সভ্য-সমাজ তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। সভ্য সমাজকে জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এবং নৈতিক মূলতত্ত্ব এ দুইটি বিষয় যদি বাস্তবিক না হয়, তবে বিজ্ঞান মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—সভ্যতা মিথ্যা। বিজ্ঞানের সত্য এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সত্য—এ দুয়ের বাস্তবিকতার উপরে সভ্য-সমাজের ভরপুর বিশ্বাস; মুখের বিশ্বাস নহে কিন্তু কাজের বিশ্বাস। সভ্যসমাজ ওতুয়ের বাস্তবিকতার উপরে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি কার্য্য-কালে তাহার উপরে একান্তঃকরণে নির্ভর করে। মুখে যদিও কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞান কিছুই নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুই নহে; কিন্তু কাজের সময়ে তাঁহাকে অগত্যা বিজ্ঞানের উপরেও নির্ভর করিতে হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপরেও নির্ভর করিতে হয়; কেননা, তাহা না করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়; দেখিয়া না শিখিলে তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। বিজ্ঞানকে অমান্য করিয়া যিনি জাহাজ চালাইতে যা'ন তিনি গম্যস্থান হইতে বিচ্যুত হ'ন; কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া যিনি সংসার নির্ব্বাহ করিতে যা'ন তিনি পুরুষার্থ হইতে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হইতে—বিচ্যুত হ'ন। সভ্য সমাজে তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারৎপক্ষে কেহই বিজ্ঞানকেও অবহেলা করে না, কর্ত্তব্য-জ্ঞানকেও অবহেলা করে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য পারৎপক্ষে সকলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে—কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সৎলোকের পরামর্শ গ্রহণ করে। কণ্টের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে তজ্জন্য শূন্যে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন করে না; মনুষ্য সমাজের বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের

মধ্যেই তাহার অন্বেষণ-কার্য্যের গোড়া-পত্তন করা বিধেয়। কেননা, সত্য সত্যই লোকে যাহাকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করে, ও যাহার উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট পথে সত্য সত্যই অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কতটুকু আছে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য অন্বেষণ করিতে যাওয়া না যাওয়া পরের কথা; প্রথম উদ্যমেই তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করা শোভা পায় না; কেন না তাহা করিলে উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা করা হয়।

এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই ইন্দ্রিয়ের অবভাস এবং জ্ঞানের সত্য এই দুয়ের মধ্যে—(বৈদান্তিক ভাষায়) অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে—প্রভেদ নিরূপণ করিলেন। পশু-দিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন শব্দ স্পর্শাদি দেশকালে প্রতিভাত হয়—মনুষ্যেরও সেইরূপ; কিন্তু মনুষ্য দেশকালের আবির্ভাব-মাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহার মধ্য হইতে সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করে; বরাহ অবতারের ন্যায় অবিদ্যার সাগর-গর্ত্ত হইতে বিদ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিদ্যার সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই যে, যেমন তেমন সত্য হইলে চলিবে না, তাহা সুনিশ্চিত হওয়া চাই—তবেই তাহাকে বাস্তবিক-সত্য বলিব। একটা জন্তু যদি তোমার বুদ্ধিতে সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার বুদ্ধিতে মৎস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর এক জনের বুদ্ধিতে কীট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে বাস্তবিক তাহা যে কি—তাহা বলিতে পারা সুকঠিন; কিন্তু যাহা সকলের বুদ্ধিতেই সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তাহা বাস্তবিকই সর্প। তেমনি আবার, মাঠের মধ্যে যদি আমি জলের মতো একটা আবির্ভাব দেখিয়া বলি যে, উহা জল হইলেও হইতে পারে, মরীচিকা হইলেও হইতে পারে; তবে,কি যে বাস্তবিক—তাহার ঠিকানা হয় না; কিন্তু যদি আমি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, উহা জল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তবে তাহা যে বাস্তবিকই জল, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ লৌকিক ব্যবহার কালেও—তাহাকেই আমরা বলি বাস্তবিক সত্য যাহা সকলের নিকটেই সত্য, এক কথায়—সর্ব্ববাদিসম্মত বা সার্ব্বভৌমিক; ও যাহা না হইলেই নয়, এক কথায়—অবশ্যম্ভাবী বা নির্ব্বিকল্প। কিন্তু এটা একটা মোটামুটি রকমের সত্য-নিরূপণ। বাস্তবিক সত্য নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা।

প্রথম দৃষ্টিতে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে—অবিদ্যার মধ্যে—সত্যাসত্য স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু তাহার মধ্যে হইতেও কাণ্ট্ দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—কি ? না দেশ-কালে অবস্থিতি। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে হইতে রূপ রসাদি সমস্তকেই ভাবনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা আকাশের যে প্রদেশটিকে এবং কালের যে সময়টিকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহা ভাবনা হইতে কিছুতেই বহিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের পক্ষে দেশ-কালে অবস্থিতি নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। দেশ-কাল-রূপী অবিদ্যা-ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্ঞানকে খাটাইয়া সেখান হই-

তেও আমরা গণিতের ধ্রুব সত্য সকল উপার্জ্জন করি; আর, এই দুইটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হই যে, ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকেই জ্ঞানে আয়ত্ত করা যাইতে পারেনা; যে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহারই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী, যথা;—গীত-ধ্বনি কতক-পরিমাণ কাল ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ উচ্চ নীচ স্বর-মাত্রা পূরণ করিয়া তবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়; আলোক কতক পরিমাণ দেশ ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা পূরণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের ব্যাপ্তি-নিরূপণ এবং মাত্রা-নিরূপণ অন্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে—অবিদ্যার কার্য্য নহে, কেবল—জ্ঞানেরই তাহা কার্য্য; তাহা যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইত তাহা হইলে পশুরাও তাহা করিত—ও সেই সূত্রে গণিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। গণিত বিদ্যার সত্য-সকল যদিও আপাততঃ দেশকালরূপী অবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, কিন্তু বহির্ব্বস্তুর অবলম্বন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। গণিতের মনঃকল্পিত চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে কিছু আর বীজ বপন করা যাইতে পারে না,—বাস্তবিক ক্ষেত্রই গণিতের শূন্য ক্ষেত্রের চরম পর্য্যাপ্তি-স্থান। আমাদের মনোমধ্য-স্থিত গণিতের সত্যকে যদি বহির্জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইত তবে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। শুধু কেবল মনোরাজ্যে নহে কিন্তু তা ছাড়া—বস্তু-রাজ্যে সংলগ্ন হয় বলিয়াই, গণিতের সত্য বাস্তবিক সত্য নামের যোগ্য। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্য দিয়া—মনোরাজ্যের মধ্যদিয়া—বস্তু-রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে, গণিত-বিদ্যা তাহারই দ্বার স্বরূপ। ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নিরূপণ দ্বারা যখন আমরা কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, তখন সেই সঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটি ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসটি গুণ-মাত্র—তাহা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; এই স্থানটিতে এই একটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুণ পরিবর্ত্তনশীল—বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার পরে আমরা লক্ষ্য বস্তুটির গুণ-পরিবর্ত্তনে অন্যান্য বস্তুর কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; এবং সর্ব্ব-শেষে আমরা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া পরস্পরাধীনতার প্রকাণ্ড একটা বাণিজ্য ব্যাপার জ্ঞানে উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া। সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, গণিত বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-মাত্রেরই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী; ভৌতিক বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের আধার বস্তু, এবং সেই আধার বস্তুর উপরে আর আর বিভিন্ন বস্তুর বল-ক্রিয়া ও অন্যের বল-ক্রিয়ার উপরে সেই আধারবস্তুর নিজের প্রতিক্রিয়া, এই তিনটি ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ করিয়া কাণ্ট পাইলেন যে, বিজ্ঞানের অভ্যন্তরেই এরূপ কতকগুলি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—যাহা একান্ত-পক্ষেই বাস্তবিক; আর ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তিও তাহার বাস্তবিকতার বিপক্ষে একটি কথারও

দ্বিরুক্তি করে না—সকলেই তাহা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—বাস্তবিক বলি কাহাকে? যাহা বস্তু-গত তাহাই বাস্তবিক; কিন্তু কাণ্টের ঐ মূলতত্ত্ব গুলি—জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব সুতরাং তাহা জ্ঞান-গত। এই কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপরি-উক্ত মূলতত্ত্ব-গুলি (যেমন কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব) যদি আমরা বহির্বিষয়ের ভূয়োদর্শন হইতে সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তবে ভূয়োদর্শনের ব্যাপ্তির সহিত তাহার নিশ্চয়তার মাত্রা অবিকল সমতুল্য হইত; অর্থাৎ যত অধিকবার আমরা কার্য্য-কারণের ভাব বাহিরে দেখিতাম, ততই আমাদের অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্বটি অধিকতর নিশ্চয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তা ছাড়া—তাহার নিশ্চয়তা একেবারেই অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। কাক কালো ইহা আমরা ভূয়োভূয় দেখিয়াছি বলিয়া তাহার নিশ্চয়তা-বিষয়ে আমরা খুবই নিঃসংশয়, কিন্তু তবুও আমরা এ কথা বলি না যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই সাদা কাক থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এইরূপ দেখা যায় যে, সকলেই এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারে যে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন-একটি স্থানেও বিনা-কারণে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যদি আগন্তুক বস্তু-সকলের ভূয়ো-দর্শন হইতে আমরা ঐ মূলতত্ত্বটি সঙ্গ্রহ করিয়া পাইতাম, তাহা হইলে ঐ মূল-তত্ত্বটিও আগন্তুক-মাত্র হইত (যেমন কাক কালো এই তত্ত্বটি)—অবশ্যম্ভাবী হইত না; তাহা আমাদের জ্ঞানের একটি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই—তাহা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই—তাহা অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-গুলি যদি এইরূপ জ্ঞান-গত ব্যাপার মাত্র হইল, তবে সে-গুলিকে আমরা বস্তু-গত বলি কেন—বাস্তবিক বলি কেন? ইহার প্রতি কাণ্টের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা যে-কোন বস্তু জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহাতেই আমরা ঐ তত্ত্ব-গুলির প্রয়োগ দেখিতে পাই; তা শুধু নয়—ঐ তত্ত্বগুলিই বস্তু-সকলের বাস্তবিকতার মূল উপাদান। ঐ তত্ত্ব-গুলি যদি কোন বস্তুতেই প্রয়োগ করিতে পারা না যাইত—তাহারা যদি আমাদের মনোমধ্যেই চাবি দেওয়া থাকিত—তাহা হইলেই তাহাদের বাস্তবিকতা সংশয়-গর্ত্তে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তাহারা বস্তু-গত না হইয়া আমাদের স্ব স্ব মনোগত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিত। বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কার্য্যই এই যে, তাহারা বস্তু-সকলেতে অভিসর্পিত হয়—তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য নাই। বস্তু-সকলেতে সংক্রামিত হওয়াই যখন তাহাদের একমাত্র কার্য্য, আর সে কার্য্য যখন তাহারা আবহমান কাল অভ্রান্ত-রূপে নিষ্পাদন করিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা বাস্তবিক (বস্তু-গত) নহে তো আর কি? তাহারা আমাদের মনোমধ্যে এক-দণ্ডও চাবি দেওয়া থাকে না—তাহারা সর্ব্ব-বস্তুতে মুক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহারা যদি বাস্তবিক নহে তবে—আর কে?

এই স্থানটিতে—কাণ্ট মনে করিলেই পারমার্থিক সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিয়া বসিলেন। কাণ্ট প্রথমে এই বলিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রকাশ

পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—বিশুদ্ধ জ্ঞানে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য। আমরা বলি যে, তাঁহার এই কথাই ঠিক্। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে, যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহা জ্ঞানগত-সত্য মাত্র;—তাহা বস্তুগত সত্য নহে—বাস্তবিক সত্য নহে; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসই বাস্তবিকতার মূল; এইখানে তাঁহার দার্শনিক নৌকা একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইল—নৌকার মাস্তুর নীচে চলিয়া গেল ও নৌকার তলদেশ উপরে উঠিল। কাণ্ট বলেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মূলে বস্তু যাহা অবধারণ করে তাহা ব্যবহারিক সত্য মাত্র, তা ভিন্ন তাহা পারমার্থিক সত্য নহে;—অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে বস্তু নহে; তবে কিনা—তাহাকে বস্তু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এমন কি—বিজ্ঞান একপদও চলিতে পারে না; এই জন্য তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার না করিলেই নয়। কাণ্টের এই কথার বিরুদ্ধে বেদান্ত দর্শন বলেন—তুমি আপনিই তো বলিয়াছ যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—অবিদ্যা—আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে না, বিশুদ্ধ জ্ঞানই কেবল আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে; আবার তবে তুমি বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া এ কথা বল কিরূপে—যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-গত সত্য, তা ভিন্ন তাহা বস্তু-গত নহে—বাস্তবিক নহে? কাণ্ট ইহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দে'ন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য (যেমন বিশুদ্ধ বস্তু-তত্ত্ব) ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত জড়িত ভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, কাজেই—সে যাহা প্রতিভাত হয় তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ঐন্দ্রিয়ক অবভাস দুয়েরই কার্য্য-কারিতা সমান মাত্রায় বিদ্যমান; তাই বলি যে, তাহা মিশ্র সত্য—বিশুদ্ধ সত্য নহে; ব্যবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শন এইরূপ বলেন যে, সেই মিশ্র সত্যের মধ্য হইতে যদি ঐন্দ্রিয়ক অংশটি (অবিদ্যাত্মক অংশটি) বর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট অংশটি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক অংশটি গ্রহণ করা যায়—তবে তাহাই তো অমিশ্র বাস্তবিক সত্য—পারমার্থিক সত্য; তাহা কি তাহাই তুমি আমাকে বল—বাজে কথা ছাড়িয়া দেও; কেননা অমিশ্র সত্য পাইলে কেহ আর তাহাকে ছাড়িয়া মিশ্র সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয় না;—এক ভরি খাঁটি স্বর্ণের বিনিময়ে একভরি তাম্র মিশ্রিত স্বর্ণ ক্রয় করিতে যায়—এমন নির্ব্বোধ কে আছে? ইহার উত্তরে কাণ্ট বলেন যে, খাঁটি সত্য আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না—যদি বা ধরা দেয় তাহা হইলেও তাহা আমাদের কোন ব্যবহারে আসে না। বেদান্ত বলেন, ব্যবহারে আসা না আসা পরের কথা—আপাততঃ তাহা জ্ঞানে ধরা দেয় কি না, তাহাই স্থির করা হউক্। খনি হইতে যে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাম্র-মিশ্রিত নহে; খাঁটি স্বর্ণকে তাম্র-মিশ্রিত করিলেই তাম্র-মিশ্রিত হয়; তাহা না করিলে তাহা—যেমন বিশুদ্ধ তেমনি বিশুদ্ধ থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করিলেই তাহা মিশ্র সত্য হইয়া দাঁড়ায়,—তাহা না করিলেই তাহা যেমন তেমনি অবিকৃত-ভাবে জ্ঞানে প্রতীয়মান হয়। আমরা আপনারাই খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করি, আবার, আপনারাই বলি যে, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না;

গোয়ালারা আপনারাই দুগ্ধের সহিত জল মিশায়, আবার—আপনারাই বলে যে, নির্জ্জলা দুগ্ধ পৃথিবীর কুত্রাপি পাওয়া যায় না—তুমিও যে দেখিতেছি সেইরূপ কথা বলিতেছ! আসল কথা এই যে, কাণ্ট্ পারমার্থিক-সত্যকে প্রাতিভাসিক রাজ্যে প্রাতিভাসিক সত্যের মতো করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—তাই তিনি প্রকৃত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে এমনি একটা অপদার্থ-রকমের সত্য পাইয়াছেন যাহা অসত্যেরই সামিল; তাহা এমনি একটি তমসাচ্ছন্ন ব্যাপার যে, জ্ঞান-জ্যোতির সঙ্গে তাহার কস্মিন্ কালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, দেখা সাক্ষাৎ হইবেও না—হইতে পারেও না। কাণ্ট্ বহু কষ্টে কূলের কাছাকাছি আসিয়া "কূল দেখিতে পাওয়া যায় কি না—দেখা যা'ক্" এই অভিপ্রায়ে দূর-বীক্ষণ যোগে কূলাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য তিনি ভুলিয়া গেলেন;—দূর-বীক্ষণের রন্ধ্র-দ্বারের কপাট উত্তোলন করিতে ভুলিয়া গেলেন! এই জন্য তিনি পারমার্থিক সত্যের কূল প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পারমার্থিক সত্যকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত জীবন্ত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে কাণ্ট্ কি দেখিলেন? না একটা অন্ধ অনির্দ্দেশ্য মৃত বস্তু—তাহা কি যে তাহার ঠিকানা নাই, আর, তাহার তিনি নাম দিলেন "The thing in itself" "বস্তু-স্বরূপ" অথবা "তৎ-স্বরূপ"। বেদান্ত দর্শনের পারমার্থিক সত্য যেমন সত্য-স্বরূপ—তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ,—সেথানে সত্য এবং জ্ঞান একাধারে বর্ত্তমান। কিন্তু কাণ্টের সেই যে "বস্তু-স্বরূপ" সেখানে জ্ঞানের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ; জ্ঞান প্রবেশ করিলে পাছে বস্তু-গত সত্য জ্ঞান-গত হইয়া উঠে এই ভয়েই কাণ্ট্ সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কিন্তু কাণ্টের এ ভয় নিতান্তই নিষ্কারণ—একটা রোগ-বিশেষ। কাণ্টের নিজের দর্শন-শাস্ত্রই আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—অতএব যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় না তাহার মধ্যেই বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য, অতএব যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় না—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা বৃথা পণ্ডশ্রম। কাণ্টের নিজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া আমাদের বাহিরে নির্দ্দেশ করি তাহাও আমাদের একটি জ্ঞানগত ব্যাপার—ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপার নহে; অতএব কাণ্টের নিজের মতানুসারেই দাঁড়াইতেছে এই যে, তিনি যাহাকে "বস্তুস্বরূপ" বলিতেছেন, তাহা জ্ঞানাত্মক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, কেননা জ্ঞানই তাহার মূল—জ্ঞানই তাহার সর্ব্বস্ব—জ্ঞান-ব্যতিরেকে তাহা কিছুই নহে। এখানে যে জ্ঞানের কথা হইতেছে তাহা তোমার জ্ঞান বা আমার জ্ঞান বা আর কোন জীবের জ্ঞান—নহে; প্রাতিভাসিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত আকাশ যেমন তোমার আকাশ নহে—আমার আকাশ নহে—কিন্তু সর্ব্বজগতের আকাশ,—কাল যেমন সর্ব্বজগতের কাল, তেমনি পারমার্থিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত জ্ঞান সর্ব্বজগতের জ্ঞান,—জ্ঞান-স্বরূপ; অথচ, আকাশ এবং কাল তোমার জ্ঞানে প্রকাশমান, আমারও জ্ঞানে প্রকাশমান, সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান; জ্ঞান-স্বরূপ

পরব্রহ্ম তোমার আমার এবং সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের বলিয়াই তিনি সূর্য্যের ন্যায় তোমারও—আমারও—এবং সকলেরই। চক্ষের পরম বিষয় কি?—অন্ধকার নহে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য; তেমনি জ্ঞানের পরম বিষয়—পরম অর্থ কি? পারমার্থিক সত্য কি? অন্ধ সত্তা নহে কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞানময়-সত্তা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কাণ্ট্ তাঁহার নিজের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবহারিক রাজ্যকে, সুপরীক্ষিত বিজ্ঞানরাজ্যকে, পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন নিতান্তই অন্ধকার দেখিল। তিনি দেখিলেন যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে—অবিদ্যাকে যদি সমূলে পরিত্যাগ করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না;—কেননা, মানিলাম কার্য্যকারণের মূলতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে বীজভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু কার্য্য দেখিলে তবে তো তাহার কারণ অবধারণ করিব? শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক রাজ্যেই কার্য্য উপস্থিত হয়—প্রাতিভাসিক রাজ্য বিলুপ্ত হইলে কার্য্যের নাম গন্ধও থাকে না; কাজেই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধেরও কোন অর্থ থাকে না। কাণ্ট্ তাই বলেন যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকল প্রাতিভাসিক সত্যকে বাস্তবিক করিয়া দাঁড় করায়—এইটিই তাহার বাস্তবিকতা; এক কথায়—তাহার বাস্তবিকতা ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে; এ নহে যে, প্রাতিভাসিক রাজ্য ছাড়িয়া উহা স্বয়ং বাস্তবিক। কাণ্টের মতানুসারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কোন মূল্য নাই—বহির্জগতে তাহাদিগকে খাটানো যায় বলিয়াই তাহাদের যত কিছু মূল্য;—হীরকের নিজের কোন মূল্য নাই—তাহা দ্বারা কাচ কাটা যায় বলিয়াই তাহার যত কিছু মূল্য; কেননা বিজ্ঞানের চক্ষে হীরক অঙ্গার-বিশেষ—বিশুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র-বিশেষ!

এইরূপ যান্ত্রিক নাগপাশ হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কাণ্ট্ মনুষ্যের ধর্ম্মভাবকে সহায় ডাকিলেন; বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রের ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, ধর্ম্ম-নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রীর ভাব দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাতিভাসিক ব্যাপার-সকলকে (বেদান্ত-দর্শনের অবিদ্যাকে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কি—তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন মনুষ্যের বন্ধনের ভিত্তি মূল, ধর্ম্মের নিয়ম সেইরূপ মনুষ্যের মুক্তির (Freedom) ভিত্তি-মূল। মনুষ্য যে, অবিদ্যার প্রতিকূলে মুক্তির পথে চলিবার অধিকারী—ধর্ম্মের নিয়মই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ধর্ম্মের নিয়ম শুধু যে, আমার নিয়ম বা তোমার নিয়ম তাহা নহে—উহা ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের ঘরগড়া নিয়ম নহে—যে-কোন জীবের বিবেচনা-শক্তি আছে সেই জীবই বুঝিতে পারে যে, মুক্তিতেই আত্মার পুরুষার্থ হয়—সুখ দুঃখের বন্ধনে পুরুষার্থ হয় না। কেননা সুখ দুঃখ প্রাতিভাসিক মাত্র—পারমার্থিক নহে। সুখ দুঃখ নিয়তই আসিতেছে যাইতেছে—তাহা কাহারো নির্ভর-স্থল হইতে পারে না—তাহা বালির বাঁধ। সুখ দুঃখ পরি-

বর্ত্তনের মুখেই নিয়ত দণ্ডায়মান। ছায়ার সুখ উপভোগ করিতে হইলে রৌদ্রের তাপ উপভোগ করা আবশ্যক; আরোগ্যের সুখ উপভোগ করিতে হইলে, পীড়ার দুঃখ উপভোগ করা আবশ্যক; অন্ন ভোজনের সুখ উপভোগ করিতে হইলে ক্ষুধার জ্বালা উপভোগ করা আবশ্যক;—সুখ অন্তর্হিত না হইলে তাহা উদিত হইতে পারে না। পরিবর্ত্তনের মুখেই সুখ-দুঃখের বুদ্‌বুদ্ উত্থিত এবং বিলীন হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-শীল ঘটনা-সকল যেমন আগন্তুক অস্থায়ী এবং প্রাতিভাসিক—মনুষ্যের সুখ দুঃখও সেইরূপ। আর প্রকৃতির মূলতত্ত্ব-সকল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অটল, বাস্তবিক এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত, ধর্ম্মের মূল নিয়মও সেইরূপ। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব সকল বস্তু-ঘটিত, ধর্ম্মের মূল নিয়ম কর্ত্তব্য-ঘটিত। সকল বস্তুই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চলে, সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলা কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম – ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য অন্ধ বস্তু হইতে চায় না—জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। অবিদ্যা মনুষ্যকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া অন্ধ বস্তু করিয়া ফেলিতে চায়—মনুষ্য সেই বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। মনুষ্য যখন অন্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে ধর্ম্ম-পথে চলে—তখন কাজেই সে প্রকৃতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না; অন্ধ প্রকৃতি যে, আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়া মনুষ্যকে মুক্তি-পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—ইহা হইতেই পারে না; এই জন্য ধর্ম্ম-পথে চলিবার সময় মনুষ্য অন্ধ প্রকৃতির নিকট হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরই ধর্ম্মের সিদ্ধিদাতা বিধাতা। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বাহির হইতে—প্রকৃতি হইতে—যে ব্যক্তি যত সুখের প্রত্যাশা করে, প্রকৃতি তাহাকে ততই সুখে বঞ্চিত করে; আর, প্রকৃতির নিকট হইতে যে বড় একটা সুখের প্রত্যাশা রাখে না, প্রকৃতি তাহাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

মনুষ্য যখন কোমর বাঁধিয়া ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হয়, তখন দেখিতে পায়—বড়ই সে কঠিন স্থান—প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্র—শুধু কেবল মুখের কথা নহে। মনে কর একজন ধনী ব্যক্তি এবং এক জন দরিদ্র ব্যক্তি দুইজনেই মনে মনে সংকল্প করিল যে, আমার মনকে আমি কিছুতেই বিচলিত হইতে দিব না—সর্ব্বদাই তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিব; আর, উভয়েই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত। হঠাৎ এক দিবস পথে দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ হইল; দরিদ্র ব্যক্তির মনে তদ্দণ্ডেই অর্থের প্রত্যাশা জাগিয়া উঠিল—ধনী ব্যক্তির মনে পালাইবার চেষ্টা জাগিয়া উঠিল;—ধর্ম্ম-পথ হইতে মন বিচলিত হইবার এই প্রথম সূত্র। দরিদ্র-ব্যক্তিটি ধনী ব্যক্তির গৃহে দুই চারি দিন যাতায়াত করাতে ধনী ব্যক্তি এক দিন বিরক্ত হইয়া দরোয়ান্‌কে দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। মনের স্থৈর্য্য কত না বিচলিত হইল! দরিদ্র ব্যক্তি যখন দেখিল যে, সহজে কিছুই হইল না, তখন সে প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কত না পদ-স্খলন! এইরূপ লাখো লাখো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম-পথে এইরূপ অল্প সূত্র হইতেই ক্রমে

ক্রমে বিপর্য্যয় ফলাও কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যক্তি-দ্বয়ের পথে মিলন-কালে এক-জনের মনে অর্থ-কামনা এবং আর এক জনের মনে পলায়ন-কামনা—ইহার পরি-বর্ত্তে যদি উভয়েরই মনে পরস্পরের মঙ্গল-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সেই অল্প সূত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্ম ফল ফলিতে পথ পাইত—সন্দেহ নাই। ধনী ব্যক্তি হয় তো প্রসন্ন চিত্তে দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করিত—দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির নানাবিধ কার্য্যের সহায়তা করিত; এবং দিন দিন উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রব-র্দ্ধিত হইত। যে ব্যক্তি জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাতে আপনি স্বাধীন ভাবে দ-ণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করেন—সাংখ্য-দর্শনের উপদিষ্ট কৈবল্য-লাভের প্রার্থী হ'ন—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার মনকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়;—একটি সামান্য কথা—একটি সামান্য দৃশ্য—একটি সামান্য ঘটনা—হয় তো চকিতের মধ্যে তাঁহার মনকে আকাশ হইতে পাতালে ফেলিয়া দিবে। অত-এব শূন্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকা মনুষ্যের পক্ষে যেমন সুদুষ্কর এমন আর কিছুই নহে। সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া যিনি স্বাধীন হইতে যা'ন, সমস্ত জগৎ তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়;—তিনি একা কত দিক্ সামলাইবেন! চারি-দিকে শত্রু পক্ষ—তাহার মধ্যে স্বাধীন-তাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার; এরূপ স্থলে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ মহা মহা ধর্ম্মবীর হাবু ডুবু খাইয়া যা'ন—যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে নূতন ব্রতী তাহার তো কথাই নাই। অতএব জগতের উপর চটিয়া এবং জগৎকে চটাইয়া চারিদিকের শত্রুতার মধ্যে স্বাধীন হইতে যাওয়া নি-তান্তই পাগ্‌লামি, কেননা সেরূপ করিয়া কেহই এক মুহূর্ত্তও স্বাধীনতাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; শত্রুতা নহে—দ্বেষ হিংসা নহে—প্রেমই স্বাধীন-তার উর্ব্বরা ভূমি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় জগতের মতে মত দিয়া চলিলে স্বাধীনতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এখন উপায় কি? উপায় আমাদের প্রতি জনের হস্তে। সত্যসতই যদি আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি, তবে জগৎও ভিতরে ভিতরে আমার মঙ্গল কামনা করিবে; আমি যদি জগতের মঙ্গল কামনা করি—তবেই জগৎ আমার বন্ধু, আমি যদি জগতের অমঙ্গল কামনা করি তবেই জগৎ আমার শত্রু; এইরূপ, জগৎকে বন্ধু করা এবং শত্রু করা আমার আপনারই হস্তে; আমি যদি আমার শত্রুর মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করি, তবে আমার সে শত্রুরও ক্রমে চক্ষু ফুটিবে;—যদিও স্বার্থের অনুরোধে বাহিরে বাহিরে সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ভিতরে ভিতরে সে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে; তাহার শরীর আমার শত্রু হইলেও তাহার অন্তরাত্মা আমার বন্ধু হইবে—তাহার কার্য্যের সহিত তাহার অন্তরাত্মার বিবাদ উপস্থিত হইবে। অত-এব, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইলে জগ-তের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল-চেষ্টা দ্বারা সর্ব্ব জগতের সহিত এবং সর্ব্ব জগতের সাধারণ কেন্দ্রের সহিত মনকে একতান করিয়া মনের সুর বাঁধা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা হইলে ক্রমে আমাদের মঙ্গল-ভাবের তেজঃপ্রভাবে জগতের দ্বেষ হিংসা এবং শত্রুতা আমাদের নিকটে আসিবা-মাত্রই অমনি নতশির হইয়া পড়িবে। এইরূপ সা-ধারণ মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা সাধা-

রণতঃ সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য ; তা ছাড়া আবার—বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যেমন—তোমার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ তোমার কর্ত্তব্য—আমার স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের মূলে যেমন গার্হস্থ্য প্রেম, সাধারণ কর্ত্তব্যের মূলে তেমনি ঈশ্বর-প্রেম ; কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে প্রেমের কোন অর্থই হয় না,—ক্রীত দাসের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রেম আদায় করা সম্ভবে না ;—যে যাহাকে প্রীতি করে, সে তাহাকে স্বাধীনভাবেই প্রীতি করে—বলের বাধ্য হইয়া কেহ কাহাকেও প্রীতি করিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের সহিত প্রেমে মিলিতে হইলে—মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যে স্বাধীনতা জগতের মঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ—যাহার অভ্যন্তরে প্রেম নাই—সেরূপ ফাঁকা স্বাধীনতা কোথাও হইতে পারে কি না—এক তো তাহাই সন্দেহ ; তাহাতে আবার, যদি বা কাহারো দুরদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া থাকে—তবে সেরূপ প্রেম-শূন্য কঠিন-প্রাণ শুষ্ক কাষ্ঠ অপেক্ষা, একটি নব-বিকসিত সরস গোলাব ফুল যাহা আজ আছে কা'ল নাই—তাহা সহস্র-গুণে ভাল। জগতের মঙ্গল-কামনা প্রেম-মূলক হইলে তবেই তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় ;—এটি কাণ্টের কথা নহে—এটি সকল দেশেরই ভক্তজনের হৃদয়ের কথা। কাণ্ট্ কর্ত্তব্য-কার্য্যকে—মঙ্গল ইচ্ছাকে—কঠোর আদেশ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন,—এবং সেই আদেশ-পালনের প্রবৃত্তিকে তিনি প্রেমের উপরে নহে কিন্তু ভক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্টের এ কথা আমাদের শিরোধার্য্য ; কিন্তু তথাপি আমরা বলি এই যে, কর্ত্তব্য-সাধন প্রথম প্রথম যেমন নীরস দেখায়—চিরকাল কিছু আর সেরূপ থাকে না ; অভ্যাসের গুণে কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন ক্রমে সহজ এবং মধুময় হইয়া দাঁড়ায়—আদিষ্ট কার্য্য জ্ঞানের কার্য্য এবং প্রাণের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়—শ্রদ্ধা (অর্থাৎ বিশ্বাস) জ্ঞানে পরিণত হয় এবং ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়। তবে কি—না কাণ্ট্ ভক্তি এবং প্রেমের মাঝখানে যেরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারি না। যাহাই হো'ক্—এটা একটি ধ্রুব সত্য যে, আমরা জগতের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করিলে আমাদের কখনই অমঙ্গল হইবে না—অবশ্যই মঙ্গল হইবে ; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" কোন কল্যাণ-কারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ;—এইটিই ধর্ম্মের সর্ব্ববাদি-সম্মত মূলতত্ত্ব। যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া—ইহা যেমন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—ইহা তেমনি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব ; উভয়ই ধ্রুব এবং অলঙ্ঘনীয়। তবে, প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের ঐ মূল তত্ত্বটি ভৌতিক নিয়ম, ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটি আধ্যাত্মিক নিয়ম ; বিজ্ঞানের ঐ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা কেবল পাই যে, সমস্ত জগৎ একই মূল-প্রকৃতির অধীন ; ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা পাই যে, সমস্ত জগৎ একই পরমাত্মার অধীন। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ স্থির করিলেন যে ধর্ম্ম-জ্ঞানই পারমার্থিক সত্যের সোপান। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ ধর্ম্মের সংগ্রাম-ক্ষেত্র ; ঈশ্বর ধর্ম্মের জয়দাতা বা সিদ্ধিদাতা ; ধর্ম্মের সাহায্যে মনুষ্য অবিদ্যার কার্য্য কারণ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান-রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রসন্নতা রাজ্যে—ক্রমশই অগ্রসর হয়।

কাণ্টের মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিজ্ঞানের সহিত পারমার্থিক সত্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই ; শুধু কেবল ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, পারমার্থিক সত্যের নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়াও

বিজ্ঞান এ যাবৎকাল স্বীয় অভীষ্ট পথে দিব্য নিরাপদে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের ভিতর পারমার্থিক সত্যকে প্রবেশ করাইলে তাহাতে তাহার লাভ কিছুই হয় না, বরং তাহাতে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় এই রূপ দেখা যায় যে, পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস-ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন হয়। কাণ্টের এ কথাটি মিথ্যা নহে; তাহার সাক্ষী—কম্‌টির নিরীশ্বর বিজ্ঞান-তন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী; কিন্তু তাঁহার নিরীশ্বর ধর্ম্ম-তন্ত্র ধর্ম্মের পক্ষে এমনি অনুপযোগী যে, তাহা সহৃদয় বিজ্ঞ সমাজে ভক্তি রসের পরিবর্ত্তে শুধু কেবল হাস্য রসেরই উদ্দীপন করে।

প্রথম দৃষ্টিতেই সহৃদয় পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কাণ্ট দুই নৌকায় পা দিয়াছেন; বিজ্ঞানের ভিতরে পারমার্থিক সত্যের দর্শন-লাভে পরাভব মানিয়া তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্যের প্রমাণাভাব; তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-জ্ঞানের মধ্যে আমরা পারমার্থিক সত্যের অব্যর্থ পরিচয় পাই। এখানে কাণ্টের সপক্ষে এই একটি কথা বলিবার আছে যে, দুই নৌকা যদি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গায়ে গায়ে জোড়া লাগানো থাকে, তবে তাহাকে ঝড়ে শীঘ্র কাবু করিতে পারে না; তাই সিংহলবাসীরা সমুদ্র-বিচরণের সময় ঐরূপ জোড়া নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে। দুই দিক্ যেখানে বিবেচ্য, সেখানে একদিকে ঝোঁক দেওয়া সময়-বিশেষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে নহে; সজোরে যখন পূবে বাতাস বহিতেছে, তখন নৌকার পূর্ব্ব পার্শ্বে ঘেঁসিয়া বসা যাত্রীদিগের কর্ত্তব্য তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু অন্য সময়ে নহে। ধর্ম্ম-সাধন-কালে প্রবৃত্তির বায়ু বহির্বিষয়ের অভিমুখে সজোরে বহিতে থাকে, এই জন্য তখন তাহার বিপরীত দিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ঝুকিয়া পড়া সাধকের কর্ত্তব্য; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে প্রবৃত্তির বায়ু প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, এজন্য তখন দুই দিকের কোনদিকে ঝোঁক না দিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কাণ্টের সপক্ষে এই যাহা বলা হইল—এস্থলে তাহা খাটে না; কারণ, কাণ্টের দুই নৌকার মধ্যে যোগবন্ধন এমনি শিথিল যে, এক নৌকা পশ্চিমে—আর এক নৌকা পূর্ব্বে—দুই নৌকা দুই দিকে ধাবমান। এক স্থানে যাহাকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর এক স্থানে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে; ধর্ম্মজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দুইকে পরস্পরের প্রতিকূলে দাঁড় করানো হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বসকলকে অন্ধ "বস্তু-স্বরূপের" উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জ্ঞান-স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার দুই নৌকা অতীব দৃঢ় বন্ধনে এক সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া যাইত। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, বিজ্ঞানের এই যে আধিভৌতিক মূলতত্ত্ব—যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া, এবং ধর্ম্মের এই যে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এ দুইটি মূলতত্ত্ব একই মূলতত্ত্বের এ-পিট ও-পিট। জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা উভয়েরই ভিত্তি-মূল। সূর্য্য যেমন আলোকের এবং উত্তাপের উভয়েরই কেন্দ্রস্থল; পরমাত্মা সেইরূপ বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের—ভৌতিক জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের—উভয়েরই কেন্দ্র-স্থল। অতঃপর বেদান্ত-দর্শনের সহিত কাণ্টের দর্শনের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বেদান্ত-দর্শন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময়ে বিজ্ঞানের এখনকার মতো এরূপ হাঁক ডাক ছিল না; গুটি দুই তিন বিজ্ঞান যাহা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্তই আবশ্যক—যেমন পর্ব্বাহ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, রোগপ্রতীকারের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান (তাহাও আবার ঠিক্ বিজ্ঞান science নহে—বিদ্যা art মাত্র)

গণনা কার্য্যের জন্য গণিত বিজ্ঞান, তান্ত্রিক মতের একরূপ রসায়ণ বিজ্ঞান, এইরূপ লোকসমাজের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি বিজ্ঞান তখন না ছিল এমন নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি না যে, প্রকৃত বিজ্ঞান তখন আলোক দর্শন করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রামাণিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দুইটি— জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান। এ দুইটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় নিঃসংশয়। বরং প্রত্যক্ষের মধ্যে ভ্রম থাকিতে পারে (যেমন মরীচিকা দর্শন), কিন্তু এ দুইটি বিজ্ঞানের কোন স্থানে এমন একটিও ছিদ্র নাই যাহার মধ্য দিয়া ভ্রম প্রবেশ পাইতে পারে—এমন একটিও ঝোপ নাই যাহার আড়ালে ভ্রম লুকাইয়া থাকিতে পারে। এ দুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহোদর-তুল্য ;—জ্যামিতির যেমন ঋজুরেখা, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি শলাকা বা ধারা ; জ্যামিতির যেমন বিন্দু, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি রেণু বা অণু ; জ্যামিতির যেমন বৃত্ত, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি চক্র ; উভয়ের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ ;— প্রভেদ কেবল এই যে, জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়—শূন্য আকাশ-খণ্ড, যন্ত্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়—ভৌতিক বস্তু। নব্য অব্দের বিজ্ঞান কিছু আর আকাশ হইতে পড়ে নাই—অবশ্য তাহা পুরাতন অব্দ হইতেই আসিয়াছে ; কিন্তু সেই সকল পুরাতন সামগ্রীকে নব্য অব্দ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে কালোচিত নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া প্রামাণিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিয়াছে। কাণ্ট জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের অভ্রান্তির উপরেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব সকল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্ট যদি শঙ্করাচার্য্যের কালে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ওরূপ একটা কাণ্ড তাঁহার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারিত না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থের কোন স্থানেই প্রামাণিক বিজ্ঞানের একটি কথারও সাড়া-শব্দ নাই। এরূপ সত্ত্বেও ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহার দর্শনের সত্য-নিরূপণ-পদ্ধতি আগাগোড়াই প্রামাণিক পদ্ধতি—সেকেলে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি বলিয়া তাহাকে যে, কেহ উড়াইয়া দিবেন, তাহার জো নাই। তিনি উপনিষদাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র;—তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন নাই,—যেখানে শাস্ত্রীয় কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অথবা যুক্তির এরূপ একটা আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই আলোকেই গম্য-পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক রাজসভায়—শাস্ত্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরের ন্যায় (সোজা কথায়—সাক্ষী গোপালের ন্যায়) সিংহাসনে উপবিষ্ট ; বিচারাদি কার্য্য যাহা নির্ব্বাহ করিবার তাহা দুই মন্ত্রী মিলিয়া নির্ব্বাহ করে ; প্রধান মন্ত্রী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয় মন্ত্রী যুক্তি। ইংলণ্ড-বাসীরা যেমন লোকরক্ষার্থে রাজার মান রক্ষা করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ শাস্ত্রের মান রক্ষা করিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধান্যার্থী যেমন ধান্যের সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসার পলাল-অংশ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানার্থী সেইরূপ শাস্ত্র-সকলের মধ্য হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমশঃ।

শান্তিনিকেতন।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের রেলওয়ে ষ্টেষণের অনতিদূরে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতন" নামক একটি সুন্দর উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ শোভাময় পরম রমণীয় প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। এই উদ্যান বাটির চারি-

দিকেই উন্মুক্ত আকাশ ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে শাল প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণী মুক্ত বায়ুতে সদাই ক্রীড়াশীল। উদ্যানে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি তরুরাজি বিহঙ্গ কূজিত হইয়া সংসার তাপিত হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিতেছে; নিকটে নির্ম্মল তোয়া সুপ্রশস্ত বাঁধ ও উদ্যান ভিতরে সুগভীর প্রশস্ত ইন্দারা। এই স্থান সাধনার অতীব অনুকূল, যেমন নির্জ্জন, তেমনি শান্তিময় পবিত্র ও রমণীয়। এখানে আসিলে সংসার কোলাহল আপনিই অন্তর্হিত হয়, মানব হৃদয় স্বভাবতই ঈশ্বর চিন্তার জন্য ব্যাকুল হয়। এই নিকেতন যথার্থই শান্তিনিকেতন, ধর্ম্ম পিপাসু নির্জ্জন সাধকের অতি প্রিয় পদার্থ। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয় বহুকাল ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ প্রাসাদ প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে মেরামত ও সুসজ্জিত করিয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং এই শান্তিনিকেতনে নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মবিচার, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, পুস্তকালয় ও অতিথি সেবার অভিপ্রায়ে, এই সুসজ্জিত শান্তিনিকেতন ও বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে কেবল ধর্ম্মার্থে উপযুক্ত ট্রাষ্টীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্র সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল অবস্থার লোকই যাহাতে এখানে পরম যত্নে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারেন, এই প্রকার সাজ সজ্জা আসবাবাদি ভুরি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহাঁরা দুই জনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্র বাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার মহাশয়ও ৩।৪ টি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিনী বাবু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর রাইপুর সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লি হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে যোগদিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষির নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু সাধারণের তাঁহার প্রতি অগাধভক্তিই ইহার কারণ। সভাভঙ্গের পর সমাগত বন্ধুগণকে সরবত ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহর্ষি মহোদয়ের দানশীলতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবনের প্রথম হইতেই বিষয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন। যাহাতে দেশ মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা জাগ্রত হয়, দেশবাসী লোকের মন ধর্ম্মপ্রবণ হয়, সে জন্য সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় সদাই ব্যাকুল, তাই বহু মূল্যের ভূসম্পত্তি ও তাঁহার এই প্রিয় শান্তিনিকেতন, যাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হইয়াছে কেবল ধর্ম্মোন্নতির জন্য দান করিলেন। এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার মহর্ষি নাম সার্থক, পরমেশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রম দ্বারা এতদ্দেশের ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সাহায্য হইবেক। এই আশ্রম ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের সাধনভূমি। তাঁহার সাধনাতে এই আশ্রমের প্রত্যেক ধূলিরেণু পবিত্র হইয়াছে। যাঁহারা বিষয়কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত, সংসারের শোক দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম পিপাসু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও সাধনশীল, পাপতাপের যন্ত্রণা দূর করিতে যাঁহারা যত্নবান, তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে, পূজ্যতম মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র শান্তি-নিকেতন আশ্রমে আগমন করুন, বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, যথার্থ ঋষি-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে মহর্ষি মহাশয়ের পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নতিকল্পে অটল অনুরাগ ও গভীর উৎসাহের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হউক। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দ্বিপেন্দ্র বাবু, মোহিনী বাবু রমণী বাবু প্রভৃতি যাঁহারা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য এখানে আগমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বোলপুর
৬ কার্ত্তিক ৫৯ ব্রাঃ সং
নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর
১৮১০ শক।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৫ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এত ক্ষণের পর তবে আমরা বেদান্ত-দর্শনের স্বক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু যিনিই যাহা বলুন—এখনো আমরা কাণ্টকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না; আমরা দেখিতেছি যে, কাণ্টের দর্শনের মধ্য হইতে বেদান্ত-পথের যেমন স্পষ্ট ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এমন আর কোথা হইতেও নহে; কাণ্টের দর্শনের মধ্য-হইতে সংশয়ের ইতস্তত-গুলা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার মন্থন করিয়া লইলে তাহাই বেদান্ত হইয়া দাঁড়ায়। কাণ্ট্ এক জন কলম্বস্-বিশেষ; তিনি বেদান্তের আমেরিকায় ঠিক-ঠাক উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে, তিনি প্রাণান্তেও ডাঙায় নাবিলেন না; তিনি ডাঙায় নাবিলেই কে যেন তাঁহার জাহাজ কাড়িয়া লইবে! আমরা তাঁহারই জাহাজের কয়েকজন যাত্রী—কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার ন্যায় জাহাজের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া দম আটকিয়া মারা যাইতে সম্মত নহি; আমরা কূলে অবতরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। কাণ্ট বলিতেছেন "খবরদার কূলে নাবিও না—মারা যাইবে।" আমরা দেখিতেছি যে, মারা যদি যাইতেই হয়—তবে জাহাজের বদ্ধ বায়ুতে মারা যাওয়া অপেক্ষা কূলের মুক্ত বায়ুতে মারা যাওয়া পরম শ্রেয়।

যাহাই হৌক্—বেদান্ত-পথের অব্যর্থ সন্ধান কাণ্ট যেমন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। কাণ্ট প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মূলে এই তিনটি অকাট্য মূলতত্ত্ব ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হয়—(১) সমস্ত গুণ-প্রবিবর্ত্তনের মধ্যে বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়, (২) পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ অবশ্যম্ভাবী, (৩) যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া; তাহার পরে কাণ্ট ঐ তিনটি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরেই পারমার্থিক সত্যের তিনটি সুড়ঙ্গ পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিরূপে পাইলেন—তাঁহার অন্বেষণ পদ্ধতি কিরূপ? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তিনটি মূলতত্ত্বের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিজ্ঞান-রাজ্যে এক রূপ—পরমার্থ-রাজ্যে আর-একরূপ, যথা;—

বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূলতত্ত্বকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত—অবিদ্যার সহিত—মিশ্রিত করা, খাঁটি সুবর্ণকে তাম্রের সহিত মিশ্রিত করা, ইহাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম অন্বয়-পদ্ধতি (অর্থাৎ সংযোগ-পদ্ধতি)—ইউরোপীয় ভাষায় method of synthesis; আর, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা-অংশ বর্জ্জিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশটি ছাঁকিয়া লওয়া, সোণার মোহর হইতে তাঁবা বাদ দিয়া খাঁটি সোণা বাহির করিয়া লওয়া, ইহাই পারমার্থিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি বা বিবেক-পদ্ধতি—ইউরোপীয় ভাষায় method of analysis। কাণ্ট অন্বয়-পদ্ধতিটিরই—সবিশেষ রসজ্ঞ; বিবেক-পদ্ধতিটি বড় একটা তাঁহার মনঃপূত নহে। কাণ্টের মনোগত ভাব এই যে খাঁটি সুবর্ণ তো আছেই—বাড়া'র ভাগ তাহার সঙ্গে যদি তাম্র মিশ্রিত থাকে, তবে সে তো একটা উপরিলাভ—তাহা ছাড়ি কেন? এই ভাবিয়া তিনি পারমার্থিক রাজ্যেও অন্বয়-পদ্ধতি খাটাইতে নিতান্তই ইচ্ছুক,—যখন দেখিলেন যে, তাহা কোন-ক্রমেই হইবার নহে—তখন তিনি পারমার্থিক সত্যের অনুশীলনে বিশেষ কোন লভ্য দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞানের উপদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন—ও সেইখানেই রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। আমাদের দেশের দর্শন-কারদিগের মনের ভাব আর একরূপ; তাহা এই যে, চিনির সঙ্গে বালি মিশাইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যা মিশাইলে—তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লভ্য কিছুই নাই; কেননা, এক তো বালির নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে আবার তাহা চিনির মূল্য কমাইয়া দেয়; অতএব চিনিকে বালি হইতে পৃথক্ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণের সময় আমাদের দেশের দর্শনকারেরা আহ্লাদের সহিত বিবেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; কাণ্ট অগত্যা তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এই জন্যই পারমার্থিক সত্যের প্রতি কাণ্টের এত অনাস্থা। কিন্তু আপাতত আমরা কাণ্টের অনাস্থা দ্বৈধ এবং সংশয়—এ সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিব না—তাঁহার মূল কথাটিতেই কেবল আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

আমরা দেখিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুশীলন-কালেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক এই দুইটি পদ্ধতি দুইটি বিভিন্ন স্থলে—একটি একরূপ স্থলে এবং আর-একটি আর একরূপ স্থলে—অবলম্বনীয়; যথা;—যখন আমি অশ্বের সাধারণ তত্ত্বগুলির পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি বিশেষ বশেষ জাতীয় অশ্বের (যেমন আরব অশ্বের, বর্মা অশ্বের, তাতার অশ্বের) বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-গুলি বর্জ্জন করিয়া, অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণ-গুলিই গ্রহণ করি; ইহারই নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমি আরব অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরব-অশ্বের বিশেষ লক্ষণ-গুলি সংযুক্ত করিয়া আরব অশ্বের বিশেষত্ব অবধারণ করি; ইহারই নাম অন্বয়-পদ্ধতি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একরূপ স্থলে আমরা ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করি—আর-একরূপ স্থলে অন্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করি। বৈজ্ঞানিক সত্যের বেলায় তো এইরূপ—কিন্তু পারমার্থিক সত্যের বেলায় উভয়-পদ্ধতিই যুগপৎ (অর্থাৎ এক সঙ্গে) অবলম্বনীয়, যথা;—ব্যতিরেক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান

হইতে অজ্ঞানকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া যখনই আমরা ধ্যানে পাই যে, পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; তখনই অন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে সেই জ্ঞানকে সমস্ত জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রাপ্ত হই যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ করিয়াই আমরা পাই যে, পরমাত্মা অনু হইতেও অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণে গুণী; তিনি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বাধ্যক্ষ; ইত্যাদি। ও-দুটি এমনি একাত্মা যে, পারমার্থিক সত্যের অনুসন্ধান-কালে কাণ্ট্ অন্বয়-পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেক পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে অন্বয়-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন;—কেননা, পারমার্থিক রাজ্যে ও-দুইটি পদ্ধতি যমক সহোদর—এ পিট ওপিট। পারমার্থিক অনুসন্ধান পদ্ধতির আর-একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, এখানে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়েরই ঐকান্তিক পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অল্প কিছুতেই চলিতে পারে না;—ব্যতিরেক-পদ্ধতিরও যেমন পরাকাষ্ঠা, অন্বয়-পদ্ধতিরও তেমনি পরাকাষ্ঠা; অণুর বেলায় অণু হইতে অণুতম—মহতের বেলায় মহৎ হইতে মহত্তম। এই রূপ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক বিশুদ্ধ জ্ঞানের একটি স্বহস্তের কার্য্য, এজন্য তাহার উপরে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। কেননা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রমাণ বিশুদ্ধ জ্ঞান নিজেই – তা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রনাণ সম্ভবে না; তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

> "মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
> এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে চা'ন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা করেন আর কিছু নয়—যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে চা'ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বলিলেই হয়। কাণ্ট্ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বস্তু গুণের মূলতত্ত্ব শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, আত্মা নির্গুণ বস্তু-স্বরূপ অথচ সমস্ত মানসিক গুণের আধার; কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, ঈশ্বর কালাতীত স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ অথচ সমস্ত জগতের আদি-কারণ; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে পরমাত্মা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সর্ব্বজগতেরই মূলাধার অথচ প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই অনুপ্রবিষ্ট।

এই তো গেল পথের বৃত্তান্ত—তা ছাড়া, পথের কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া কোন স্থানে পৌঁছিতে হইবে, কাণ্ট্ তাহারও একটি ধারাবাহিক ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা,—

"There is in the progression from our knowledge of ourselves (the soul) to a knowledge of the world and through it to a knowledge of the supreme being, something so natural that it looks like the logical progression of reason from premisses to a conclusion. ইহার অর্থ;—আত্মজ্ঞান হইতে বিশ্ব-জ্ঞানে এবং বিশ্ব-জ্ঞান হইতে পরমাত্ম-জ্ঞানে উপসংক্রমণের যে একটি পদ্ধতি, তাহা এমনি স্বাভাবিক যে, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন —ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি-পদ্ধতি সাধন হইতে সিদ্ধির দিকে ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইতেছে।

কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্ট্ সংশয়ের ধূলি উড়াইয়া তাঁহার ঐ পথের আ-

দ্যোপান্ত সমস্তই তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন—সেই ধূলি-রাশি অপসারিত করিয়া অনেক কষ্টে তবে আমরা পথটির অন্ধি-সন্ধি পাইয়াছি,—যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা যত পারি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কাণ্টের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে বস্তু-গণ, তাহার পরে কার্য্য-কারণ, তাহার পরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—এই তিনটি তত্ত্ব উত্তরোত্তর ক্রমে অবলম্বন করিয়া আমরা আত্ম-তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্বে এবং প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হই, যথা ;—মনে কর প্রথমে আমরা পৃথিবীকে একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করিলাম ; ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে, পৃথিবী আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা সূর্য্য হইতে উদ্ভূত এবং সূর্য্যের আকর্ষণে বিধৃত; অতএব, গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য সমস্ত ধরিয়া তবেই তাহা একটি সমগ্র বস্তু; পৃথিবী কেবল তাহার একটি অঙ্গ—এই পর্য্যন্ত ; তা' ভিন্ন—সমগ্র বস্তুর ভাব পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সমগ্র বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে—তাহার মতো একটি সর্ব্বাঙ্গীন বস্তু আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাই না ; যাহাকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরি—তাহারই নিকটে শুনি যে, "আমার বস্তু আমাতে নাই—আমি আমাতে নাই ;" পৃথিবী বলে যে, আমার বস্তু সূর্য্যে রহিয়াছে, সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয় ;—পেয়াদার নিকটে যাই সে পেস্কারকে দেখাইয়া দেয়—পেস্কারের নিকটে যাই সে নায়েবকে দেখাইয়া দেয়,—নায়েবের নিকটে যাই সে জমিদারকে দেখাইয়া দেয়—ক্রমাগতই এইরূপ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে জিজ্ঞাসার চালান হইতে থাকে, কোথাও আর কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ইহাতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, সমগ্র বস্তুর একটি ভাব আমাদের আত্মাতে আছে বটে কিন্তু তাহা ভাব-মাত্র—সে ভাবের অনুরূপ একটিও বস্তু প্রকৃতি-রাজ্যের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে, তাহা অবশ্য বস্তুর সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা করে ; এই জন্য প্রকৃত বস্তুকে কোথাও দেখিতে না পাইলেও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। বেদান্ত-দর্শনের মতে এটা এক প্রকার পুত্তলিকার বিবাহ দেওয়া ; পুত্তলিকার বিবাহ যেমন মিথ্যা বিবাহ—যাহাকে আমরা সচরাচর বস্তু বলিয়া অবধারণ করি তাহাও সেইরূপ মিথ্যা বস্তু। সত্য বস্তু তবে কি ? আপাততঃ পৃথিবীকেই সমগ্র একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করা যা'ক্; এখন, এই পৃথিবীর সঙ্গে অবশিষ্ট সমস্ত জগতেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে—তাহা এরূপ যে, পৃথিবীর যদি একটি রেণু-কণা বিকম্পিত হয়—তবে সেই সূত্রে সমস্ত জগৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকম্পিত হইবেই হইবে। সমস্ত জগতের সহিত পৃথিবীর এই যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইহা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই চলিতেছে ; এইজন্য এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিকে যদি হস্তের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সমস্ত জগৎকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ও সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে একই পরম বস্তুর উপলব্ধি হয় ; তাহা হইলে যে বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই বস্তু আমাদের হস্তগত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অন্তরে বস্তুর ভাব যাহা বিদ্যমান আছে—সমস্ত জগতের মূলাধারকে প্রাপ্ত হইলে তবেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে; আর, তাহা হইলেই পাওয়া যায় যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার পরব্রহ্ম তিনিই প্রকৃতির মূল-কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মা। এখানকার প্রকৃত মর্ম্ম-কথাটি এই;—প্রথমে বস্তু-জিজ্ঞাসা; কাণ্ট্ বলেন যে, বস্তুর ভাব-একটি আমাদের আছে বটে কিন্তু তাহা বস্তুর জ্ঞান নহে; "বস্তুর ভাব" না বলিয়া যদি "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলা যায়, তাহা হইলে কাণ্টের ঐ কথাটি সকলেরই সহজে হৃদয়-ঙ্গম হইতে পারে; কেননা, "বস্তু জি-জ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে বস্তুর ভাব একটি আছে কিন্তু বস্তু-জ্ঞান এখনো হয় নাই; কেননা এক দিকে যেমন বস্তুর ভাব না থাকিলে বস্তু-জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না, আর-এক দিকে তেমনি বস্তু-জ্ঞানের অ-ভাব না থাকিলেও বস্তু-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ হইতে পারে না; অতএব কাণ্টের এই যে একটি কথা—যে, বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব, ইহার ল্যাজা মুড়া একত্র করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা আর কিছু নয়—বস্তু-জিজ্ঞাসা। "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই জিজ্ঞাসুর অস্তিত্ব—জীবাত্মার অ-স্তিত্ব—প্রতিপন্ন হয়; অতএব বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব যাহা আমাদের আছে, তাহাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতি-পন্ন হইতেছে। তাহার পরে বস্তু-ভ্রম; যেমন, প্রথমে পৃথিবীকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—পৃথিবী সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়;—সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়; ইত্যাদি;—এইরূপ বিফল পরি-ভ্রমণকেই ভ্রম বলে—ভ্রান্তি বলে; ইহা-তেই কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ, তস্য কারণ, এইরূপ কার্য্য-কারণময় প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরে বস্তু-জ্ঞান; ইহাতে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সেই সূত্রে সমস্ত জগতের ঐক্য-বন্ধন প্রতীয়মান হয়; আর, তাহাতেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সর্ব্বজগতের মূলাধারকে পাইয়া আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। এইরূপে, একদিকে আমরা বস্তুর ভাব হইতে কার্য্য-কারণময় নানা বস্তুতে এবং নানা বস্তু হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সমস্ত জগতে এবং সেই সূত্রে সর্ব্ব-মূলাধার পরম পুরুষে উপনীত হই; আর-এক দিকে বস্তু-জিজ্ঞাসা হইতে বস্তু-ভ্রমে এবং বস্তু-ভ্রম হইতে বস্তু-জ্ঞানে উপনীত হই; জীবাত্মা হইতে প্রকৃ-তিতে এবং প্রকৃতি হইতে পরমাত্মাতে উপনীত হই।

কাণ্টের পথ অনুসরণ করিয়া চরমে আমরা এইরূপ পাইতেছি যে, সত্য জি-জ্ঞাসা—জীবাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরি-চায়ক; সত্য-ভ্রম প্রকৃতির অস্তিত্বের সা-ক্ষাৎ পরিচায়ক; এবং সত্যজ্ঞান পরমা-ত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক। আরো এই যে, সত্য জিজ্ঞাসার আড়ালে সত্য-জ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে এবং লুকাইয়া থাকিয়া সত্য জিজ্ঞাসাকে উস্কাইয়া দি-তেছে। সত্য-জিজ্ঞাসা একটি হরিণ; তাহার নাভিতেই কস্তূরি (সত্যজ্ঞান) রহিয়াছে; হরিণটি সেই কস্তূরির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বনময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ভ্রমা-রণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যখন কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে হতাশ

হইয়া বসিয়া পড়ে—তখন সত্যজ্ঞান তাহার তৃষিত নয়নে আবির্ভূত হয়; মেদিনী গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হইলে, তবেই বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহার সমস্ত তাপ দূর করিয়া দেয়। কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থ ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—কাণ্টের দর্শনের গোড়ার কথাটিতেই বেদান্তের এই তত্ত্বটি বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, সর্ব্ব-মূলাধার পরমাত্মাই পরাকাষ্ঠা পারমার্থিক সত্য, অথচ—কাণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই; এই জন্য তাঁহার গ্রন্থের শেষ-ভাগে যখন তিনি ঐ তত্ত্বটিকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তাহার মূল খুঁজিয়া না পাইয়া বিষম এক ধন্দচক্রে নিপতিত হইলেন,—তাঁহার নাভিতেই যে কস্তুরি রহিয়াছে ইহা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাণ্টের দর্শন যদি তেমন এক-জন পাকা বারিষ্টারের আড় প্রশ্নোত্তরের (Cross examination এর) পাল্লায় পড়ে, তবে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়, যথা;—

বারিষ্টারের প্রশ্ন। তুমি এ কথা বলিয়াছ—যে, ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কোন একটা বহির্বস্তুর গুণ-সঞ্চার হইলে ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সেই বহির্বস্তুকে আপনার আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে যায়?

কাণ্টের উত্তর। হাঁ উহা আমারই কথা বটে।

প্রশ্ন। তুমি আর-এক স্থানে এ কথা বলিয়াছ যে, আমরা যাহাকে বহির্বস্তু বলি তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—জ্ঞান-ছাড়া তাহা কিছুই নহে? এরূপ কথা বলিয়াছ কি না?

উত্তর। আমি এই বলিয়াছি যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। বাহির হইতে গুণ-পরম্পরা একটি-একটি করিয়া ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া সেই-সমস্ত বিচ্ছিন্ন গুণ-পরম্পরার মোট বাঁধিয়া সমস্তটা এক যোগে গ্রহণ করে, আর এইরূপ স্থির করে যে, সে-যাহা সে গ্রহণ করিল তাহা শুদ্ধ কেবল গুণ-সমষ্টি, কিন্তু তাহার মূলে বস্তু কোন-না-কোন অবশ্যই আছে,—কিন্তু সেই যে,বস্তু,তাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত,—ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে গুণই কেবল উপস্থিত; বস্তু ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত—অথচ আমাদের জ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব তত্ত্ব যে, তাহা আছেই আছে—তাহা না থাকিলেই নয়। তাই বলি যে, বস্তু-তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার, প্রত্যয়েরই ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে—বহির্ব্যাপার নহে। ইহার একটি উদাহরণ;—মনে কর "ঈ" এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করিতে ঠিক্ দুই মুহূর্ত্ত সময় লাগে; আর, মনে কর সেই ঈ-ধ্বনিটি আমার কর্ণে উপস্থিত হইল। দুই মুহূর্ত্ত ধরিয়া ঈ ধ্বনিত হইল; সুতরাং প্রথম মুহূর্ত্তে সমস্ত ঈ-ধ্বনি নহে—তখন শুদ্ধ কেবল "ই" এইটুকু উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সেইরূপ আর একটি "ই" উপস্থিত হইল; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র ঈ-ধ্বনি (দীর্ঘঈ) উপস্থিত হয় নাই—দুই মুহূর্ত্তে দুইটি "ই" (হ্রস্বই) পরে পরে উপস্থিত হইল—এই পর্য্যন্ত। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে যখন দুই মুহূর্ত্তে দুইটি হ্রস্ব ই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইল—জ্ঞান তখন কি করিল? না সেই দুইটি হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া একটি দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিল; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রে

একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং তথায় আর একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইল—এই মাত্র; সমগ্র দীর্ঘ ঈ কোন কালেই ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সমগ্র দীর্ঘ ঈ জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে। তা শুধু নয়—ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই দুইটিও জ্ঞানেরই গড়িয়া-তোলা জিনিস্। কেননা, দুই মুহূর্ত্তে যেমন দীর্ঘ ঈ বাহির হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তে তেমনি হ্রস্ব ই বাহির হইয়াছে; অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তে হ্রস্ব ই অপেক্ষাও হ্রস্বতর ই বাহির হইয়াছে—সন্দেহ নাই; অতএব, জ্ঞান যেমন দুই হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া এক দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিয়াছে—তেমনি দুই হ্রস্বতর ই জুড়িয়া এক হ্রস্ব ই গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমে, দীর্ঘ ঈ ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই আইসে—হ্রস্ব ই ধরিতে গেলে হ্রস্বতর ই আইসে—হ্রস্বতর ই ধরিতে গেলে আরো হ্রস্বতর ই আইসে—ঈ-ধ্বনির মূলান্বেষণ অবশেষে হ্রস্বতম ই'তে গিয়া ঠেকে; কিন্তু হ্রস্বতম ই ধরিতে ছুঁইতে পাইবার বস্তু নহে—জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। ব্যাপারটি ঠিক্—"ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল!" অতএব নিছক যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই না বলিলেই হয়; ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরাকে জ্ঞান যখন নিজ-গুণে—হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈ বা একটা কোন কিছু করিয়া গড়িয়া তোলে তখনই তাহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিষয় (যেমন ঈধ্বনি) তাহা ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরারই সমষ্টি-বন্ধন; ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কেবল গুণই উপস্থিত হইয়াছে (যেমন ই ই) তাহা ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত হয় নাই; অতএব ইহা নিঃসংশয় যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের অভ্যন্তরে "বস্তু" যাহা আমরা অবধারন করি, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আদবেই কোন হস্ত নাই—তাহা নিছক জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেরূপ জ্ঞান-গত বস্তু ছাড়া জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না? ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহা আমি জানি না; কেন না, মনে কর যেন তাহা বাস্তবিকই আছে—কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাহার থাকা-না-থাকা বিষয়ে আমি হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহাই যেন তুমি জান না, কিন্তু জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে—এটা অবশ্য তুমি জান?

কাণ্ট। এ আবার কিরূপ প্রশ্ন! আছে কি নাই—তাহাই যখন আমি জানি না, তখন তাহা কার্য্য করে কি করে না তাহা আমি কিরূপে জানিব? তোমার সন্তোষের জন্যই হউক্, বা আমার আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই হউক—আমি যেন বলিলাম যে, তাহা কার্য্য করে; কিন্তু তাহা আছে কি নাই তাহা আমি জানি না—সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে যে, তাহা মূলেই নাই, তাহা যদি হয় তবে আমার সে কথা কোথায় রহিল? যে—কার্য্য করিবে সে নাই অথচ আমি বলিতেছি যে, সে কার্য্য করিতেছে! ইহা অপেক্ষা হাস্য জনক ব্যাপার আর কি

আছে? অতএব আমি যখন বলিলাম যে, আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, তখন তাহাতেই তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, কার্য্য করে কি করে না তাহাও আমি জানি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি নাই তাহাও তুমি জান না, কার্য্য করে কি করে না তাহাও তুমি জান না; কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, বহির্বস্তু কার্য্য করে; কেন না তুমি গোড়াতেই বলিয়াছ যে, বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে। জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে কি করে না—এইটিই তুমি জান না; কিন্তু বহির্বস্তু কার্য্য করে—এটা তুমি বিলক্ষণই জান;—তবেই হইতেছে যে, তুমি যাহাকে বহির্বস্তু বলিতেছ তাহা জ্ঞানাতীত বস্তু নহে। আবার, ইহাও তুমি বলিয়াছ যে, সেই যে বহির্বস্তু, যাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য-করে, তাহা তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। কেননা তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছ যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত হয় না—গুণই উপস্থিত হয়। তা শুধু নয়—তোমার কথা অনুসারে আরো এইরূপ দাঁড়ায় যে, গুণের মোট-বন্ধন-কার্য্যেও জ্ঞানের বিলক্ষণ হস্ত রহিয়াছে, অতএব ধরিতে গেলে—গুণও জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; কিন্তু সে কথা এখন যাইতে দেও। এখন কেবল বস্তুর কথা হইতেছে। তোমার চরম সিদ্ধান্ত তবে এই;—বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে; আর, সেই যে বহির্বস্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে, তাহা জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, সেই যে বহির্বস্তু যাহা তোমার জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার তাহাই তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিয়া তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমার জ্ঞান যদি গোড়াগুড়িই জাগ্রত থাকে, তবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য আবশ্যক হয় না; আর, তোমার জ্ঞান যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে তাহার নিজেরই একটি ব্যাপার কিরূপে তাহাকে জাগাইবে? প্রসুপ্ত জ্ঞানের "ব্যাপার" আবার কি? ব্যাপার বন্ধ থাকা'র নামই তো প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত জ্ঞান (ব্যাপার খরচ করিয়া) কিরূপেই বা আপনাকে আপনি জাগাইবে? তুমি যখন নিদ্রায় অভিভূত, তখন কি তুমি আপনাকে আপনি জাগাইতে পার—না তুমি পড়িয়া গেলে আপনাকে আপনি স্কন্ধে করিয়া উঠাইতে পার? ইহা সুনিশ্চিত যে, প্রসুপ্ত ব্যক্তি নিজের কোন ব্যাপার দ্বারা আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, বহির্বস্তু—যাহা তোমার জ্ঞানের (প্রসুপ্ত জ্ঞানের) নিজেরই একটি ব্যাপার, তাহাই তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে! এটা কিরূপে সম্ভবে?

কাণ্ট যে ইহার কি উত্তর দিবেন—আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা বেদান্তের কূলে নিরাপদে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি যে, কাণ্ট এত কিনারায় আসিয়াছেন যে, ডাঙায় উঠিলেই হয়; তাহা না করিয়া তিনি শুধু শুধু অনর্থক—সাধ করিয়া—সংশয়ের তুমুল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। গোড়াতে কাণ্ট এই কথা বলিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইত যে, বস্তুতত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত—অতএব তাহা যে,

শুধু কেবল তোমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার বা আমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার—তাহা নহে, তবে কি? না তাহা সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের একটি ব্যাপার, তাহা সর্ব্বজ্ঞানের ব্যাপার; প্রত্যেক জ্ঞানের অভ্যন্তরেই সর্ব্বজ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে; প্রসুপ্ত জ্ঞানের অভ্যন্তরেও সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জাগ্রত আছেন।

"য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"—কঠোপনিষদ্।

ইহার অর্থ;—সুপ্তেতে সুপ্তেতে জাগ্রত থাকিয়া যিনি সকলেরই প্রয়োজনীয় বিষয়সকল নির্ম্মাণ করেন তিনিই শুক্র তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হ'ন; সর্ব্বজগৎই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞানেরই ব্যাপার; সর্ব্বজ্ঞানই প্রসুপ্ত ব্যষ্টি-জ্ঞানকে (জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞানকে) জাগাইয়া তুলিবার মূলাধার। যদি বল যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞানকে কিরূপে জানিলে? তবে তাহার উত্তর এই যে, আমি এই যে ব্যষ্টি জ্ঞান—আমি সর্ব্বজ্ঞানেরই অংশ,—এই সম্পর্ক-সূত্রে আমি সর্ব্বজ্ঞানকে জানিতেছি। যেমন খণ্ড আকাশ দেখিবা-মাত্র আমি অসীম মহাকাশকে সেই সূত্রে উপলব্ধি করি,—সেইরূপ, ব্যষ্টি জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের অভ্যন্তরেই যে, সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—ব্যক্তিগত জ্ঞানের (limited experienceএর) অভ্যন্তরেই যে, সার্ব্বভৌমিক নির্বিকল্প জ্ঞান ভিতরে ভিতরে জাগিতেছে,—কাণ্টের সমস্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত জুড়িয়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা, কাণ্টের সমস্ত মূলতত্ত্ব-গুলিই সার্ব্বভৌমিক এবং নির্বিকল্প—একটিও ব্যক্তিগত নহে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অভ্যন্তরে সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম—জাগ্রত রহিয়াছেন। ইহাই বেদান্ত! আমাদের এখানকার মন্তব্য কথাটি সংক্ষেপে এই;—

প্রথমে, সত্য-জিজ্ঞাসা; মূল-সত্য কি—ইহার অন্বেষণ। জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে। জিজ্ঞাসা হয় না কাহার? না প্রথমতঃ যাহার মূলেই জ্ঞান নাই তাহার; দ্বিতীয়তঃ যাহার জ্ঞানের অভাব-বোধ নাই তাহার। জিজ্ঞাসাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানও আছে—জ্ঞানের অভাব-বোধও আছে; জিজ্ঞাসাতে জ্ঞানাজ্ঞান প্রকাশ পায়—অল্প-জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্য-জিজ্ঞাসা অল্পজ্ঞ জীবের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য ভ্রম;—জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমে আমরা যাহাকে তাহাকে মূল সত্য বলিয়া অবধারণ করি; সন্দারের উপরেও যে সন্দার রহিয়াছে—এটা আমরা ভুলিয়া যাই। কেহ বলেন যে, যান্ত্রিক বলই মূল সত্য; কেহ বলেন তাড়িত পদার্থই মূল সত্য; কেহ বলেন প্রাণই মূল সত্য; ইত্যাদি। বৈদান্তিক ভাষায় ইহারই নাম রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, অসত্যে সত্য-ভ্রম—অবিদ্যা। অবিদ্যাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জগতের মধ্যস্থিত কোন বস্তুরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—সমস্তই আপেক্ষিক; বৈদান্তিক ভাষায়—জগতের